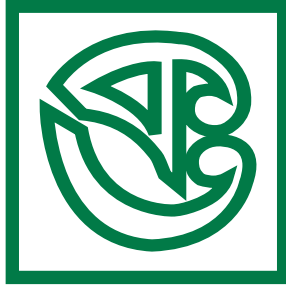


# করুণাময়ী বিশাখা



সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

# করুণাময়ী বিশাখা

সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বি, এ

**কৰুণাময়ী বিশাখা**  
**KARUNAMAYEE BISHAKHA**

BY

*Satya Prasanna Barua B.A.*

উত্তৰায়ন

১৭ হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়—

শ্রী সবিতা বড়ুয়া

১৭, হেমসেন লেইন,

চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে—

সলিল বড়ুয়া বি.কম

**অভিকা প্রেস,**

১৮২, আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার,

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ—

শ্রী সঞ্চয় বড়ুয়া

বেতাগী, রাঙ্গুণীয়া।

১ম সংস্কারণ—

বৈশাখী পূর্ণিমা

২৫ শে বৈশাখ, ১৪১৬ বাংলা,

৮ই মে, ২০০৯ ইং

প্রাপ্তিস্থান—

**নালন্দা**

১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য : ৩৮ টাকা মাত্র।

## উৎসর্গ

ঠাকুরমা স্বর্গীয়া মন্দাদরী বড়ুয়া

স্বর্গীয়া দিদিমা

দাদু \* গগন চন্দ্র বড়ুয়া,

(দিদিমার ভাই)

দিদিমা \* কামিনী বড়ুয়া

(বড় কাকার শাশুড়ি)

ও

অপর স্বর্গীয়া দিদিমাগণ,

যাঁদের আদর-যত্ন, শুভেচ্ছা ও

আশীর্বাদে আমার শৈশব ও কৈশোর জীবন

নিরাপদ ও আনন্দপূর্ণ হয়েছিল

তাঁদের স্মরণে

ও

পারলৌকিক সদৃগতি কামনায়

সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া

## সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মগধ রাজ্য	১
২। বিশাখার জন্ম	১
৩। স্রোতাপত্তিফল লাভ	২
৪। সাকেত নগরের উৎপত্তি	২
৫। কুমারী বিশাখার জনসেবা	৩
৬। বিশাখার বিবাহ	৩
৭। পঞ্চ কল্যাণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৪
৮। দশটি উপদেশ	৮
৯। স্বশ্রুতালয়ে বিশাখা	৯
১০। বিশাখার বিচার ও মৃগার শ্রেষ্ঠীর ত্রিশরণ গ্রহণ	৯
১১। উপদেশগুলোর মর্মার্থ	১১
১২। মৃগার মাতা বিশাখা	১৩
১৩। অষ্টবর প্রার্থনা	১৩
১৪। স্ত্রী বিশাখা	১৬
১৫। মহালতা প্রসাধন দান	১৬
১৬। পূর্বরাম নির্মাণ ও দান	১৭
১৭। উপোসথ	১৯
১৮। লোক বিজয়	২১
১৯। অন্তিম জীবন	২২
২০। পরিশিষ্ট-১ বৌদ্ধ কর্মবাদ	২৫
২১। পরিশিষ্ট-২ সম্যক চেতনা	৩০
২২। পরিশিষ্ট-৩ বিবাহ বিধি	৩৬

## ভূমিকা

দেখেছি তাঁকে  
আসা যাওয়ার ফাঁকে  
সিরাজদৌল্লাহ্ সড়কে আন্দরকিন্ধায়  
নজির আহমদ চৌধুরী রোডের কিনারায়  
আজাদী অফিসের সমুখে  
এবং জামালখান লেনে ঈষৎ আনত মুখে  
অস্তিকা প্রেসে  
অতি সাদামাটা ড্রেসে ।  
দেখেছি তাঁকে পত্রিকা সম্পাদনায়  
রকমারি পুস্তক রচনায়  
এবং মুদ্রণে  
কিন্মা প্রুফ সংশোধনে  
পুলকিত হর্ষে  
লেখক পাঠক সাথে পরামর্শে ।  
এখন দেখি বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াতে  
ধ্যানস্থ হতে ভাবনাতে  
তিনি কে? তিনি জীবন-যুদ্ধে লড়ুয়া  
সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া ।

১৯৬০ সালে আমার পরিচয় সদ্য স্নাতক সত্য প্রসন্ন বড়ুয়ার সাথে । তখন চট্টগ্রামে দু'টি যুব সংগঠনের অস্থিতি ছিল— ইয়ং ম্যানস্ ব্রুডিস্ট এসোসিয়েশন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংঘ । ঐক্য প্রত্যয়ী সত্য বাবু সেই সময় গড়ে তুললেন বৌদ্ধ মিলন সংঘ । সমান্তরাল চৈতন্যে চালাতে লাগলেন অস্তিকা পত্রিকা এবং পরবর্তীতে অস্তিকা প্রেস । সেদিন একজন স্নাতক যুবকের জন্য সোনার হরিণ নামক চাকুরীর দ্বার খোলা ছিল । কিন্তু সত্যপ্রসন্ন বাবু সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে, প্রেস, পত্রিকা ও জীবিকার জন্য শিক্ষকতা করে জীবন সংগ্রামে লড়ে গেলেন, জয়ী হলেন । কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়—

করো যুদ্ধ বীর্যবান যায় যবে যাক্ প্রাণ,  
মহিমাই জগতে দুর্লভ ।

হ্যাঁ, সত্যবাবু মহিমাবিত । প্রথমত: চট্টগ্রামের পত্র পত্রিকার ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে । দ্বিতীয়ত: তিনি একজন সফল শিক্ষক । তৃতীয়ত: তিনিই বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম আত্মজীবনী লেখক । চতুর্থত: তিনি একজন সার্থক পিতা ।

সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া ছাত্রদের জন্য সহজ পাঠ্য বই লিখেছেন; লিখেছেন ধর্মীয় গ্রন্থ । সুসাহিত্যিক সত্যপ্রসন্ন বাবু পণ্ডিত এবং আমার অগ্রজতুল্য । বৌদ্ধ ধর্মে অগ্রজের ও প্রবীণের নির্দেশ মানাকে উত্তম মঙ্গল বলা হয়েছে । সত্যদা আমাকে তাঁর পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । নিজের হিতের জন্য আমি কী তা অমান্য করতে পারি? কিন্তু সুমন পাঠক, মুক্তক ছন্দে কবিতাকারে

ভূমিকারম্ভ ইতোপূর্বে দেখেছেন কী? মনে হয়, না। আসলে আনন্দের আতিশয্যে ও নিষ্কলুষ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সত্যদার প্রতি শ্রদ্ধাবশত লিখে ফেললাম।

মহামানব বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে নারীদের সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য। ভিক্ষুণীবৃন্দের অনেকে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমী অগ্রশ্রাবিকা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবা ও দানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া, আম্রপালি ও বিশাখা প্রমুখ। অশোকের সময়ে সংঘমিত্রা শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে গমন করেন। আরেকজনা নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রীলংকায় বোধিচার্য নিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে বিশাখা নামটি অবিস্মরণীয়। আজও ভিক্ষুদের বর্ষাবাস যাপনকালে যে বর্ষা চীবর দান করা হয়, তার উৎস যে বিশাখাই। শ্রীযুক্ত বাবু সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া রচনা করেছেন সেই করুণাময়ী বিশাখার জীবন চরিত।

আমি বইটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। বইটিতে উনিশটি শিরোনাম রয়েছে। প্রথমে বিশাখার জন্ম ও শৈশবকালীন বর্ণনা নিহিত। সাত বছর বয়সে বুদ্ধ দর্শন ও দেশনা শ্রবণে তিনি সদ্ধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর বলা হয়েছে সাকেত নগরের উৎপত্তি কথা। তৎপর বিশাখার জনসেবা ও বিবাহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে বিশাখার কেশ কল্যাণ, মাংস কল্যাণ, অস্থি কল্যাণ, ছবি কল্যাণ ও বয়স কল্যাণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সখিসহ বিশাখার স্নান শেষে মৃগার শ্রেষ্ঠপুত্র পুণ্যবর্ধনের জন্য পঞ্চ কল্যাণবতী পাত্রীর অন্বেষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশাখার রূপে ও কোন্টি অশোভনীয় প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বিশাখা তাঁর পিতামাতাকে জানাবার অনুরোধ করলেন। বিশাখা যে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা-এটাই তাঁর প্রমাণ। শ্বশুরালয়ে যাত্রার প্রাক্কালে পিতা কর্তৃক বিশাখাকে প্রদত্ত দশটি আচরণীয় বিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্বশুরালয়ে বিশাখা নিজ চরিত্র ও ব্যবহার মাধুর্যে সকলকে মুগ্ধ করলেন। দিগম্বর সন্ন্যাসীদের বন্দনা না করার জন্য শ্বশুর বিশাখাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বললে বিশাখা পিতা কর্তৃক দশটি উপদেশের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে শ্বশুর বিশাখাকে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে নেয়ার অনুমতি দিলেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনার পর শ্বশুরের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তিনি সদ্ধর্ম গ্রহণ করলেন। বিশাখার বুদ্ধ সমীপে আটটি বর প্রার্থনার মধ্যে ছিল বর্ষাচীবর দানসহ অপরাপর দানের প্রার্থনা। লেখক স্ত্রী হিসেবে বিশাখা, বিশাখার মহালতা প্রসাধন দান ও নিজেই তা কিনে নিয়ে পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করিয়ে দেয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিশাখা বুদ্ধের নিকট উপোসথ ও লোক বিজয় সম্পর্কে দেশিত হয়েছিলেন। বিশাখাকে মৃগার মাতা বলা হত। এটা একটা চমকপ্রদ কাহিনী। লক্ষণীয় যে, বিশাখা অল্প বয়সে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। দেহত্যাগের পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সুলেখক সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া প্রতিটি উদ্ধৃতির ঋণ স্বীকার করেছেন। এটি প্রশংসনীয়। কেননা, বৌদ্ধদের অনেকে ঋণ স্বীকার করে না। পরিশিষ্টে রয়েছে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও সম্যক চেতনা নামক দু'টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দু'টিতে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ ও লেখকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণীত আছেই।



সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি, 'যে রচনা সরল ও স্পষ্ট, পাঠক পড়িবা মাত্র সহজে বুঝিতে পারে তাই উত্তম রচনা।' সমরৈখিক অনুভবে বলতে পারি, লেখক সত্য প্রসন্ন বড়ুয়ার করুণাময়ী বিশাখা পুস্তকটির ভাষা সহজ, সরল ও স্পষ্ট। স্বল্প শিক্ষিতসহ শিক্ষিত মাত্রই পুস্তকটির ভাষা বুঝতে পারবেন। বিশাখা চরিত্র বৌদ্ধ নারীদের অবশ্য গ্রহণীয়। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর দশটি উপদেশ ও বুদ্ধের উপদেশ প্রতিপাল্য হওয়া সমীচীন। বৌদ্ধদের ঘরে ঘরে বইটি সযত্নে সংরক্ষিত হবে, আশা করি। কাম্য, সকলের সমাদৃতি লাভ করুক বইটি। তাহলে লেখকের শ্রম সফল ও সার্থক হবে।

### শিশির বড়ুয়া

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারী কলেজ।

সানমার ডাইনিংস

তাং-১১-০২-২০০৯

এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম।

## নিবেদন

১.

বুদ্ধ বলেছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,

এবম্পি সৰ্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।—করণীয় মৈত্রী সূত্র  
বঙ্গানুবাদ- মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়ে একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, সেরূপ সকল জীবের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করবে।

মাতা নিজের জীবনের বিনিময়েও একমাত্র পুত্রের জীবনই রক্ষা করেন মাত্র। কিন্তু অন্যের পুত্রের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের তেমন ভূমিকা লক্ষ্যগোচর হয় না। অন্যের পুত্রের, এমন কি অন্য জীবের জীবন রক্ষার জন্য এগিয়ে যান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহান করুণাময় পুরুষ ও করুণাময়ী নারী। বিশেষ করে, যাঁদের অন্তর মহাকারণিক মহাপ্রজ্ঞাবান তথাগত বুদ্ধের মহাকারণার কল্যাণ-স্পর্শে স্নাত হয় অথবা তাঁর প্রবর্তিত সদ্ধর্মের তথা আর্থ-অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনের মাধ্যমে যাঁদের চিন্তের রাগ-দ্বेष-মোহ রূপ কলুষ-কালিমা দূরীভূত হয়ে চিত্ত নিষ্কলুষ, নির্মল, পবিত্র, শান্ত ও একাগ্র হয়ে চিত্ত অফুরন্ত প্রেম-প্রীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মৈত্রী-করুণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ হয়, তাঁরাই পারেন সকল জীবের প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করতে, এমন কি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যের জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে যেতে। এমনি একজন মহিয়সী করুণাময়ী ত্যাগব্রতী, দানশীলা, শীলবতী বুদ্ধপথিক নারী ছিলেন মহোপাসিকা আর্থশ্রাবিকা মৃগার মাতা বিশাখা। এই ত্যাগব্রতী শীলবতী বিশাখার জীবন চরিত্র রচনা করেছেন আর একজন মহান শীলবান ত্যাগী পুরুষ আজন্ম ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাবান সুসাহিত্যিক, সুপণ্ডিত, সংঘ মনীষা, সাহিত্যরত্ন, অগ্গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজ মহাসংঘরাজ শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির

মহোদয়, যাঁর কৃতজ্ঞতাভাজনদের মধ্যে আমার নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বইটি ছাপানো হয়েছিল ১৯৬৪ ইংরেজীতে। বর্তমান সময়ে এমনি একজন বুদ্ধপথিক ত্যাগব্রতী শীলবতী ও দানশীলা মহিয়সী নারী হলেন থাইল্যান্ডের ডঃ বনকোট সিথিপোল (মাতাজী) )। তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশের ৫৭টি বুদ্ধ মন্দিরে ৫৭টি বুদ্ধমূর্তি দান করে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

২.

আমার মাতা প্রয়াতা নিরবালা বড়ুয়াও একজন বুদ্ধপথিক শীলবতী নারী ছিলেন। সদ্ধর্মের আলোকে তাঁর অন্তরলোকও আলোকিত হয়েছিল। তাই তিনি পাড়া-পড়শী, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সবাইকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি সবাইর শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছিলেন। তিনি বড় কোন রোগে না ভুগে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি ২০০৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী ৯৮ বছর বয়সে হেমসেন লেনের বাসায় সচেতনভাবে পরলোক গমন করেন। তাঁর সাপ্তাহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান গ্রামের বাড়ী ইদিলপুর গ্রামে সুসম্পন্ন হয়। সে সময় আমন্ত্রিত ভিক্ষুদের এক কপি করে মহাকারুণিক বুদ্ধ বই উপহার দিয়েছিলাম। এসময় ভদন্ত বিপুলানন্দ থের মহোদয় বললেন, ‘সত্যবাবু বিশাখা চরিত লিখবেন।’ আমি তখন কিছু বলিনি। আমার জানা ছিল পূজনীয় ভদন্ত শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বিশাখা বই ছাপিয়েছিলেন। কিন্তু বইটি আমার পড়া হয়নি। বইটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছে কিনা, হলেও চালু আছে কিনা তা জানা ছিলনা। এ সময় আমার ‘প্রার্থনা পদ্ধতি, বন্দনা ও প্রতিপাল্য নীতি’ ছাপানোর কাজে ব্যাপ্ত ছিলাম। ওটা ছাপা হলে পূজনীয় ভাস্তের কথা মনে হলো। অতঃপর নালন্দা থেকে এক কপি ‘বিশাখা’ এনে পড়া আরম্ভ করলাম। দেখলাম, প্রাপ্ত পুনঃ ছাপানো বইটিতে অসংখ্য মুদ্রণ ভুল। এর কারণ বুঝলাম না। শ্রদ্ধেয় ভাস্তে ছিলেন সুপণ্ডিত। প্রেসের সাথেও তিনি বহুকাল জড়িত ছিলেন। তদুপরি তখনকার সময়ে উন্নত প্রেস হাবীব প্রিন্টিং প্রেসে আমি ভাস্তেকে নিয়ে গিয়ে মালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সেই হাবীব প্রিন্টিং প্রেস থেকে তিনি বহু বই ছাপিয়েছিলেন। অধিকন্তু প্রফ সংশোধন করেছিলেন দুইজন সুপণ্ডিত শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বড়ুয়া এম, এ ও শ্রীযুক্ত ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া, বি, এ। পরে জানতে পারলাম, এটা পুনঃমুদ্রিত হচ্ছে এবং তাতে বানান ও অন্যান্য ভুল থাকতে পারে।

৩.

সুবিনয়ী সুগৃহিনী, সুমাতা, সুঠাকুরমা, সুপ্রতিবেশিনী তথা সুনাগরিক করুণাময়ী বিশাখার জীবন চরিত জানা প্রত্যেকের বিশেষ করে কুমারী

বালিকাদের একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আগ্রহী কর্মব্যস্ত পাঠকপাঠিকা দের সুবিধার্থে আমি তাঁর জীবন চরিত সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করছি। সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে হয়তো অনেক মূল্যবান অংশও বাদ পড়ে গেছে। অধিকন্তু ভাষার দুর্বলতা হেতু এই মহিয়সী করুণাময়ী নারীর জীবন চরিত যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। অবশ্য অনুসন্ধিসু পাঠক পাঠিকারা শ্রদ্ধেয় ভাস্কের বইটি পড়ে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বইতে আমি অলৌকিকতা, অবাস্তবতা ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত থাকার এবং চরিত্র রচনায় আধুনিক বৌদ্ধিক যুগ্ম মানস গঠনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি।

৪.

এই বইয়ের মূল ভিত্তি শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শ্রী শীলালংকার মহাস্থবির মহোদয়ের ‘বিশাখা’, আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়ার ‘মহামানব বুদ্ধ’ ও আমার মহাকারণিক বুদ্ধ। পাঠকবর্গকে সাহিত্য রসে আপ্ত করবার জন্য সুসাহিত্যিক সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় ভাস্কের বই থেকে কোথাও কোথাও উদ্ধৃত করে দিয়েছি। বইটির শেষে ২টি প্রবন্ধ যোগ করেছি।

পরিশিষ্ট ১ ‘বৌদ্ধ কর্মবাদ’। মহামান্য উপসংঘরাজ শাসন শোভন সদ্ধম্ম জ্যোতিকাধ্বজ ডঃ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মহোদয় প্রবন্ধটির প্রফ কপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশিষ্ট ২ ‘সম্যক চেতনা’। প্রবন্ধটির পান্ডুলিপি ভারতের শ্রদ্ধেয় বুদ্ধরক্ষিত থের মহোদয় ও ডঃ জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয় পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

পরিশিষ্ট ৩ এ ‘বিবাহ বিধি’ সংযোজন করেছি। বৌদ্ধরা তথাকথিত মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটক সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এ তিন ভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো প্রতিপাল্য নীতি ও দর্শন। তাই কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদের মনে মন্ত্রতন্ত্রের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস আছে, বৌদ্ধদের মধ্যে সেরূপ বিশ্বাস থাকার কথা নহে। তবে সাধারণ গৃহীরা শীল এবং সূত্রকেও কখনো কখনো ‘মন্ত্র’ বলে থাকে। যেমন, কেউ কেউ “শীল গ্রহণ করতে আস” না বলে “মন্ত্র নিতে আস”—এরূপ বলে থাকে। এতে দোষের কিছু নেই। অবশ্য লিখবার ক্ষেত্রে কেউ এগুলোকে ‘মন্ত্র’ বলে লিখে না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বিবাহ মন্ত্রের ক্ষেত্রে। বিবাহ মন্ত্র দিয়ে নর ও নারীর মিলনকে

সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার বিধান এটা। অতএব এটা হলো সামাজিক প্রথা। বৌদ্ধধর্ম কোন প্রথাকেই নিরুৎসাহিত করে না, যদি ইহা নির্দোষ ও মানুষের কল্যাণকর হয়। প্রকৃত প্রক্ষে, এটা হলো নর ও নারীকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রণালী। তাই এটাকে ‘মন্ত্র’ না বলে বৌদ্ধিক নামকরণ করা প্রয়োজন। আমি তাই বিবাহ বিধি শিরোনাম দিয়েছি। সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ এটা গ্রহণ করলে অথবা এর চেয়ে ভালো নামকরণ করলে আমি খুশি হবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ডঃ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মহোদয় আমার এই নামকরণ সমর্থন করেছেন।

ভদন্ত প্রিয়রত্ন থের মহোদয় ‘বিবাহ বিধি’ গ্রন্থ কপি দেখে দিয়েছেন। তিনি পালি শব্দের উচ্চারণ সংশোধন করে দিয়েছেন। বিশেষ দ্রষ্টব্যে তা দেয়া হয়েছে। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

‘স্টার প্লাস’ এর মালিক বাবু শ্রী মিলন দেব ভূমিকা, নিবেদন, পরিশিষ্ট ১ বৌদ্ধ কর্মবাদ, পরিশিষ্ট ২ সম্যক চেতনা ও পরিশিষ্ট ৩ বিবাহ বিধি কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়ে বইটি দ্রুত প্রকাশে সহায়তা করেছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। অস্তিকা প্রেসের কম্পিউটার কম্পোজার মোঃ শাহাদাত হোসেন করুণাময়ী বিশাখা দ্রুত কম্পোজ করে দিয়েছে। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা অধ্যাপক শ্রী শিশির বড়ুয়া পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির গুরুত্ব বর্ধন করেছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। এই বই ছাপানোর ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার বড় বৌমা শ্রীমতী বিনু বড়ুয়া বি, এ, মেজ বৌমা টিকলি বড়ুয়া বি, এ, পরীক্ষার্থী, ছোট বৌমা তুলিকা বড়ুয়া (টিনা) বি,বি,এ প্রমুখ। তুলাবাড়িয়া নিবাসী শ্রীমতী প্রতিভা বড়ুয়া মহাকারণিক বুদ্ধ বই বিক্রয় করে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। আশা করি, পাঠকবর্গের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি, গঠনমূলক সমালোচনা ও অভিমত পুস্তকটির পরিবর্ধন ও দোষত্রুটি বর্জনে সহায়তা করবে।

# করুণাময়ী বিশাখা

## মগধ রাজ্য :

মগধ রাজ্য ছিল শিক্ষা-সভ্যতা ও ঐশ্বর্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক উন্নত। ক্ষত্রিয় কুলতিলক বিম্বিসার তখন মগধের রাজা ছিলেন। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। রাজা বিম্বিসার ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ। ফলে জনগণ শান্তিতে বসবাস করছিলো। দেশে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তার লাভ করেছিল। তখন ধনী লোকদের শ্রেষ্ঠী বলা হতো। মগধে তখন পাঁচজন মহা ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মেণ্ডক, জ্যোতিয়, জটিল, পূর্ণ ও কাকবলিয়, এ পাঁচজন শ্রেষ্ঠী অফুরন্ত সম্পদের মালিক হয়েছিলেন।

মগধ রাজ বিম্বিসার বুদ্ধের একান্ত অনুগত ছিলেন। গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ গৌতম প্রথমে মগধ রাজ্যে আগমন করেছিলেন। এখানে রাজা বিম্বিসারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। রাজা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি যেন মগধে গিয়ে রাজাকে নতুন ধর্মবাণী শুনান। তদ্ধেতু বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ সারনাথ থেকে রাজগৃহে এসেছিলেন রাজাকে ধর্মদেশনা করতে। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনে রাজা বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রাজগৃহে বুদ্ধকে এক বিশাল উদ্যান দান করেন। এই উদ্যানের নাম বেণুবন উদ্যান। এই উদ্যানে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের থাকার জন্য বেণুবন বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেণুবন বিহারে বুদ্ধ বহু বছর বসবাস করেছিলেন। মগধের অন্যতম উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী নগর ছিল ভদ্রিয়। এই ভদ্রিয় নগরেই ছিল মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর আবাস।

## বিশাখার জন্ম :

ধনকুবের মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্রের নাম ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী এবং পুত্রবধুর নাম সুমনা দেবী। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ঔরসে ও সুমনা দেবীর গর্ভে জন্ম হয় পুণ্যশ্লোকা মহিষাসী দানশীলা রূপবতী বিশাখার। পুণ্যলক্ষণ বিমণ্ডিত অপরূপ লাবণ্যময়ী পৌত্রীকে দর্শন করে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি নাতনীর লালন-পালনের সুবন্দোবস্ত করলেন। নাতনীর নামকরণ দিবসে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী দীন দরিদ্রকে অনু, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করলেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীও বহু মুদ্রা দান করলেন। বিশাখা হাঁটতে শেখার সাথে সাথে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী তাঁর খেলা-ধুলার জন্য তাঁর সমবয়সী বহু

প্রতিবেশী শিশুকন্যার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর সহচরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সখীরাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও মমতা বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিলো। “বিশাখাও তাদেরকে দেখতেন প্রীতিনেত্রে এবং বিমুগ্ধ করে রাখতেন ভালবাসার অজেয় মোহিনী শক্তিতে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট সকলেই হার মানতো। ক্রীড়া কৌতুকে পরাস্ত করতেন সকলকে। দিনের পর দিন বিশাখার প্রতিভা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রতুৎপন্ন মতিত্বের কার্যকলাপ দর্শনে সখীরা বিস্ময়ে হয়ে যেতো হতবাক।”

### স্রোতাপত্তিকল লাভ :

শ্রেষ্ঠী কন্যা ভাগ্যবতী বিশাখা পরম সুখের মধ্য দিয়ে সপ্তম বর্ষে উপনীত হলেন। এমনি সময়ে তথাগত বুদ্ধ শশিষ্য পদার্পণ করলেন মগধ রাজ্যে। তিনি ধর্ম প্রচার করতে করতে ভদ্রিয় নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ সংবাদ শুনে মেগুক শ্রেষ্ঠী এক মহতী শোভাযাত্রা সহকারে বুদ্ধকে আশু বাড়িয়ে নিতে ছুটে গেলেন। বিশাখাও সখীদের নিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। শোভাযাত্রা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তথাগত বুদ্ধের সম্মুখীন হলো। পুণ্যপুরুষ বুদ্ধকে দর্শন করে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হলেন এবং বুদ্ধকে বন্দনা জানালেন। সপ্তবর্ষীয়া বালিকা বিশাখা বুদ্ধকে দর্শন করে অভিভূত হয়ে পুনঃ পুনঃ বুদ্ধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অতঃপর শশিষ্য বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে বিশাখাসহ সবাই ভদ্রিয় নগরের নির্দিষ্ট বিহারে উপস্থিত হলেন। সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে তথাগত বুদ্ধ ধর্ম দেশনা আরম্ভ করলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে মেগুক শ্রেষ্ঠী ও বিশাখা প্রমুখ বহু লোক সত্য ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বিশাখাসহ অনেকে স্রোতাপত্তি ফল লাভে হলেন কৃতার্থ, তাঁদের অপায় গমনের দ্বার হলো চিররুদ্ধ। মেগুক শ্রেষ্ঠী ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হয়ে আজীবন বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করলেন। মেগুক শ্রেষ্ঠীর একান্ত অনুরোধে বুদ্ধ সে'বার আট মাস ভদ্রিয় নগরে অবস্থান করেছিলেন।

### সাক্ষেত নগরের উৎপত্তি :

তৎকালে ভারতে অপর একটি ঐশ্বর্যশালী রাজ্য ছিল কোশল। কোশলের রাজা প্রসেনজিত ছিলেন তৎকালীন ভারতের পরাক্রান্ত রাজাদের অন্যতম। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। বুদ্ধ এই শ্রাবস্তী নগরে বহু বৎসর অবস্থান

করেছিলেন। তাই শ্রাবস্তী পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিত ও মগধরাজ বিম্বিসার উভয়েই সম্পর্কে পরস্পর ভগ্নীপতি ছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন মহাভাগ্যবান ধর্মপরায়ণ ও দানশীল মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন। কিন্তু রাজা প্রসেনজিতের রাজ্যে তদ্রূপ একজনও মহাশ্রেষ্ঠী ছিলেন না। এজন্য তিনি মনে মনে দুঃখবোধ করতেন। অতঃপর তিনি মনস্থ করলেন, ভগ্নীপতি রাজা বিম্বিসারকে অনুরোধ করে অন্ততঃ পাঁচজনের যে কোনও একজনকে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসবেন। তখন তিনি সপরিষদ রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিম্বিসারের নিকট তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। রাজা বিম্বিসার বললেন, কাকেও স্থানান্তরিত করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে মেগক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী যেতেও পারেন। রাজা প্রসেনজিত তাতে সম্মত হলে রাজা বিম্বিসার ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট এ প্রস্তাব দিলেন। তখন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ্যে যেতে রাজী হয়ে গেলেন। অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ইচ্ছামত রাজা প্রসেনজিত তাঁর রাজ্যে মগধের সীমান্ত সংলগ্ন জনবিরল একটি প্রদেশ ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর বসবাসের জন্য প্রদান করলেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর অক্লান্ত চেষ্টায় ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহযোগিতায় এ প্রদেশে একটি সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠলো। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর স্বকীয় পছন্দমতো নগর খানা নির্মিত হয়েছিল বলে এর নাম রাখা হয়েছিল সাকেত নগর।

### কুমারী বিশাখার জনসেবা :

বিশাখার শিক্ষা দীক্ষার প্রতি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বিশেষ যত্ন নিতে লাগলেন। এতৎসঙ্গে তাঁকে দান কার্যে উৎসাহ দিতেন। তিনি বিশাখার দ্বারাই দান করিয়ে আনন্দ পেতেন। করুণাময়ী বিশাখা দরিদ্র ও পীড়িতের দুঃখ দূর করার জন্য নিজেকে সবসময়ই ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁর সখীরা তাঁকে একাজে সহায়তা করতেন। “তাঁর স্নেহময় হস্তের সেবা, মধুর স্নেহ-সম্ভাষণ ও প্রিয়ালপ সকলকেই মুগ্ধ করতো।” তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর বিশাখা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন। তাঁর রূপ-লাবণ্যের কাহিনীও লোকমুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

### বিশাখার বিবাহ :

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে মৃগার নামে একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর সম্পদ রাজগৃহের পঞ্চ মহাশ্রেষ্ঠীর মত না হলেও শ্রাবস্তীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠীর চেয়ে

বেশি ছিল বলা চলে। তবে তিনি ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ও উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের পরম ভক্ত। দান কার্যেও তিনি অনুদার ছিলেন। তাঁর বড় ছেলের নাম—‘কুমার পুণ্যবর্ধন’। পুণ্যবর্ধন রূপবান যুবক। শিক্ষা ও জ্ঞানেও তিনি শ্রাবস্তীতে অদ্বিতীয়। তবে কিছুটা বিলাসপ্রিয়। তাঁর বিবাহের বয়স হয়েছে। তাই তাঁর পিতা-মাতা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি বললেন, পঞ্চ কল্যাণবতী (লক্ষণবতী) মেয়ে হলেই আমি বিয়ে করতে সম্মত আছি। স্ত্রীলোকের পঞ্চ কল্যাণ হলো— কেশ কল্যাণ, মাংস কল্যাণ, অস্থিকল্যাণ, ছবি কল্যাণ ও বয়স কল্যাণ।

### পঞ্চ কল্যাণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :-

যে নারীর ভ্রমর-কৃষ্ণ চুল পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, সেই নারীকে কেশ কল্যাণবতী বলে। যে নারীর দন্তাবরণ অধরোষ্ঠ পক্ষু বিদ্বফলের বর্ণের মতো এবং সুখস্পর্শ হয়, তাকে মাংস কল্যাণবতী বলে। যে নারীর দন্তরাজী সমান, ঘন ও হ্রিহীন তাকে অস্থি কল্যাণবতী, যে নারীর দেহচর্ম স্নিগ্ধ, মসৃণ ও রূপশ্রী মণ্ডিত, তাকে ছবি কল্যাণবতী এবং যে নারী স্থির — যৌবনা ও সু-স্বাস্থ্যবতী, তাকে বয়স কল্যাণবতী বলা হয়।

পুণ্যবর্ধনের পিতা মৃগার শ্রেষ্ঠী তখন বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাদ্য-ভোজ্য দানে তৃপ্ত করলেন। অতঃপর তিনি প্রস্তাব করলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্য হতে অভিজ্ঞ আটজন ব্রাহ্মণকে তাঁর ছেলের জন্য পঞ্চ কল্যাণবতী মেয়ে খোঁজ করার জন্য ঘটককার্যে নিয়োজিত করা হোক। ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আটজন বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণকে একাঙ্গে নিয়োজিত করলেন। মৃগার শ্রেষ্ঠী ভাবী পুত্রবধুকে পরিচয় দেয়ার জন্য লক্ষমুদ্রা মূল্যের একখানা হীরামুক্তা খচিত হার ও পাথের স্বরূপ বহু মুদ্রা তাঁদিগকে দিলেন এবং বললেন যে, কাজে সফল হলে তিনি তাঁদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করবেন। ঘটকেরা ভারতের বহু প্রসিদ্ধ নগর ও জনপদ অন্বেষণ করতে করতে সাকেতনগরে এসে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তাঁরা সাকেত নগরের এক নদীর তীরবর্তী পান্থশালায় বিশ্রাম করছিলেন।

সেদিন ছিল সাকেত নগরে নক্ষত্র উৎসব। এ উৎসবে কুমারী মেয়েরা অলঙ্কৃত হয়ে অপ্রতিচ্ছন্ন অবস্থায় পদব্রজে নগরের পার্শ্ববর্তী নদীতে গিয়ে স্নান করতো। সে দিন অন্যান্য কুমারী মেয়েদের সাথে বিশাখাও তাঁর সহচরীদের নিয়ে ঐ পান্থশালার পার্শ্ববর্তী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন।



স্নানের পর বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তাঁর সখীরা বৃষ্টিতে সিক্ত হবার ভয়ে অন্য বালিকাদের সাথে দৌড়ে গিয়ে নিকটবর্তী ঐ পাছশালায় প্রবেশ করলো। ঘটকগণ এ সুযোগে কুমারীদের মধ্যে পঞ্চ কল্যাণবতী মেয়ে পাওয়া যায় কিনা তা লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু এরূপ কাকেও দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরে বিশাখা সিক্ত বসনে ধীর পদক্ষেপে পাছশালায় প্রবেশ করলেন। তখন পাছশালার সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। ঘটকগণ এটা লক্ষ্য করে বিশাখার দিকে তাকালেন। বিশাখার রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁরা প্রথমেই বিশাখার মধ্যে চারটি লক্ষণ দেখতে পেলেন। শুধু অস্থি কল্যাণবতী কিনা তা দেখতে বাকি রইল। তাই কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কপটতার আশ্রয় নিয়ে বিশাখার সাথে কথা বলার সুযোগ করে নিলেন। একজন ঘটক বললেন, বিশাখা বড় কুঁড়ে স্বভাবের মেয়ে। অন্য কুমারীরা সিক্ত হবার ভয়ে দ্রুত এসে পাছশালায় প্রবেশ করলো। আর ধীর গতিতে আসার কারণে তাঁর দেহ ও বস্ত্রালংকার সিক্ত করে ফেলেছে। একথা শুনে বিশাখা বিনয়-নম্র বচনে তাঁদের বললেন, তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালিনী। এতৎ সত্ত্বেও তিনি দ্রুত আসেননি। এর অনেক কারণ আছে। ঘটকগণ কারণগুলো জানতে চাইলে বিশাখা বললেন—

“চার জনের দ্রুত গমন শোভা পায় না। এ ছাড়া অন্য কারণও আছে।

১. অভিষিক্ত রাজা যদি রাজাবরণে বিভূষিত হয়ে কোমর বেঁধে দ্রুত গমন করেন, তা’হলে তাঁকে শোভা পায় না; লোকেরা নিন্দা করবে — ‘সাধারণ লোকের মত রাজা দৌড়াচ্ছেন’। সুতরাং মন্ডুর গমনেই রাজাকে শোভা পায়।

২. রাজার অলঙ্কৃত মঙ্গল-হস্তীর দ্রুতগমন অশোভনীয়। গজলীলায় গমনেই শোভা পায়।

৩. প্রব্রজিতের দ্রুত গমন শোভা পায় না। লোকেরা নিন্দা করবে — ‘এ শ্রমগটি গৃহীর মতো দৌড়াচ্ছেন’। সুতরাং প্রব্রজিতের পরিমিত গমনেই শোভা পায়।

৪. স্ত্রীলোকের দ্রুত গমন অশোভনীয়। লোকেরা নিন্দা করবে। ‘এ রমণীটি পুরুষের মতো দৌড়ছে কেন’ ?

অন্য কারণ হলো— মেয়েরা দ্রুত গমনকালে হয়তো পদক্ষলনও হতে পারে, পড়ে হাত-পাও হয়তো ভাঙতে পারে। মাতা-পিতা কতো যত্নে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাড়িয়ে তোলেন; অসাবধানে পা পিছলিয়ে পড়ে যদি হাত-পা ভেঙ্গে যায়, তাহলে তাকে সারা জীবন পিতৃকূলের বোঝা হয়ে অতি দুঃখেই কালাতিপাত করতে হয়।

(বিশাখা-শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, পৃঃ ৩৩-৩৪)

অতঃপর বিশাখা ঘটকদের বললেন— এবার আপনারাই বলুন, আমি ধীর পদক্ষেপে এসে কি অন্যায় করেছি?

ঘটকেরা বললেন— না মা, তুমি বড়ো বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মেয়ে।

বাক্যালাপের সময় তাঁরা দেখতে পেলেন বিশাখার অপূর্ব শোভন দন্তরাজী। তাঁরা বুঝতে পারলেন, বিশাখা অস্থি কল্যাণবতীও। এই পঞ্চ লক্ষণ দর্শনে ঘটকগণ স্থির নিশ্চিত হলেন— এ মেয়েটিই পুণ্যবর্ধনের উপযুক্ত।

ঘটকগণ বিশাখাকে তাঁদের প্রস্তাব জানালে বিশাখা তাঁদের কাছে পুণ্যবর্ধন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ঘটকগণ বিশাখাকে পুণ্যবর্ধন সম্বন্ধে সবিস্তারে জানালে বিশাখা তাঁদের বললেন— আমার মাতা-পিতার সম্মতিই সর্বাত্মে প্রয়োজন। আমার পিতা-মাতা সম্মত হলে আমার অমত হবে না। আপনারা আমার পিতার নিকট আপনাদের প্রস্তাব নিবেদন করুন। ঘটকদের একথা বলে বিশাখা পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট ঘটকদের আগমনের সংবাদ পাঠালেন।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ কয়েকটি অশ্বরথ প্রেরণ করলেন। বিশাখা রথারোহণে সহচরী ও ঘটকগণকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরলেন। অতঃপর ঘটকগণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সজ্জিত আসনে বসিয়ে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কুশলাদি বিনিময়ের পর তাঁদের আগমনের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন। ঘটকগণ সবিস্তারে মৃগার শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদ ও তাঁর পুত্র পুণ্যবর্ধনের রূপ-গুণ ও বিদ্যাবত্তার বর্ণনা দিয়ে পুণ্যবর্ধনের জন্য বিশাখাকে সম্প্রদানের প্রস্তাব করলেন। তখন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ঘটকদের দু'দিন অবস্থান করার আবেদন জানালেন। অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীতে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর পাঠিয়ে কুমার পুণ্যবর্ধন ও মৃগার শ্রেষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে নিলেন। যেহেতু রূপে-গুণে পুণ্যবর্ধন ছিল

শ্রাবস্তীতে অতুলনীয়, তাই মৃগার শ্রেষ্ঠীর ধনসম্পদ তাঁর চেয়ে অনেক কম হলেও তিনি কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হয়ে গেলেন। তখন ঘটকগণ মৃগার শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত সেই বহু মূল্য স্বর্ণহারখানা বিশাখাকে পরিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর থেকে বিদায় নিয়ে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

শ্রাবস্তীতে গিয়ে ঘটকগণ মৃগার শ্রেষ্ঠীর নিকট বিশাখার রূপ-গুণ ও বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তদুপরি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর অফুরন্ত ধনসম্পদের বর্ণনা দিয়ে অবিলম্বে বিবাহকার্য সম্পন্ন করার তাগিদ দিলেন। সেদিনই মৃগার শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ প্রসেনজিতের নিকট গিয়ে আপন পুত্রের সাথে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর মেয়ের পরিণয় সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর মেয়ের সাথে পুণ্যবর্ধনের বিয়ের কথা শুনে রাজা অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন যে, তিনিও বরযাত্রী হয়ে তাঁদের সঙ্গে যাবেন।

অতঃপর মৃগার শ্রেষ্ঠী রাজা প্রসেনজিতের সাথে পরামর্শ করে আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে যাওয়ার দিন ধার্য করলেন এবং এ সংবাদ ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট পাঠালেন। তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, সপরিষদ রাজা প্রসেনজিত বরযাত্রী হয়ে সেখানে যাবেন। এ সংবাদ শুনে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বিবাহের আয়োজনে লেগে গেলেন। বিশাখা সহচরীদের নিয়ে পিতাকে একাজে সহযোগিতা করতে লাগলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মৃগার শ্রেষ্ঠী বহু লোক নিয়ে যাত্রা করলেন। সপরিষদ রাজা প্রসেনজিত এসে তাদের সাথে যোগ দিলেন। তারপর সবাই জাঁক-জমক করে অগ্রসর হতে হতে সাকেত নগরের অদূরে একটি উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অবস্থান করে মৃগার শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট তাঁদের আগমনের সংবাদ জানালেন। এ সংবাদ পেয়ে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বরযাত্রীদের আগু বাড়িয়ে আনার জন্য মঙ্গল ঘট ও মঙ্গলবাদ্যসহ বহু লোক পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি কন্যাকে বরযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্য বললেন এবং নিজে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সাকেত নগরের সম্ভ্রান্ত লোকদের আহ্বান করে আনার জন্য লোক নিযুক্ত করলেন। বিচক্ষণ বিশাখা যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে রাজা, মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য বরযাত্রীদের জন্য সুবন্দোবস্ত করলেন।

যথাসময়ে বরযাত্রীরা মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ও সাকেত নগরবাসীরা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানানলেন।

অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী সুদক্ষ স্বর্ণকার দ্বারা বহু কোটি টাকা মূল্যের ‘মহালতা প্রসাধন’ নামক এক অদ্বিতীয় ও অভিনব মহা অলঙ্কার তৈরী করালেন। এই ‘মহালতা প্রসাধন’ আপাদ-মস্তক পরিবৃত্ত বিচিত্র লতা-কর্ম পরিশোভিত বহুমূল্য রত্নখচিত চারুশিল্প বিমণ্ডিত বৈচিত্রপূর্ণ এক মহা অলঙ্কার।

কথিত আছে বিশাখার জন্মান্তরে মহাপুণ্যের প্রভাবেই এরূপ দুর্লভ মহা অলঙ্কার লাভ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বজন্মের উপচিত পুণ্যই মহা কল্যাণজনক হয়।

### দশটি উপদেশ :

বিশাখা মাতা সুমনা দেবীর আদর্শে মানুষ হয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাবতী। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মেয়েকে আদেশ – উপদেশ দিয়ে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর সংক্ষিপ্ত কথাতেই তিনি পিতা কি বলতে চান তা বুঝে নিতেন। সেদিন স্বস্তুর বাড়ী যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মেয়েকে স্বস্তুরালয়ে কূলবধুর মেনে চলার কয়েকটি নিয়ম সংক্ষেপে বলে দিলেন।

সেই নিয়মগুলো হলো :-

- ১। স্বস্তুরালয়ে ঘরের অগ্নি বাইরে নিও না।
- ২। বাইরের আগুন ভিতরে এনো না।
- ৩। যে দিয়ে থাকে, তাকে দিও।
- ৪। যে দেয় না, তাকে দিও না।
- ৫। যে দিয়ে থাকে তাকেও দিও; আর যে দেয় না, তাকেও দিও।
- ৬। সুখে বসবে।
- ৭। সুখে আহার করবে।
- ৮। সুখে শয়ন করবে।
- ৯। অগ্নি পরিচর্যা করবে।
- ১০। গৃহদেবতাকে নমস্কার করবে।

পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মেয়েকে এই দশটি উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

মৃগার শ্রেষ্ঠীও এসব উপদেশ শুনলেন। কিন্তু সৎক্ষিপ্ত উপদেশাবলীর অর্থ বুঝতে না পারায় ভুল বুঝে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হয়ে রইলেন।

শারদীয় পূর্ণিমার শুভ প্রভাতে বিশাখা শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বক্ষণে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশলরাজ প্রসেনজিত ও মৃগার শ্রেষ্ঠী প্রমুখ বরযাত্রীদের সম্মুখে শ্রাবস্তীর আটজন ধনী, খ্যাতনামা ও পরাক্রান্ত প্রাজ্ঞ লোককে অনুরোধ করলেন যে, বিশাখাকে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মেয়ে মনে করে কোনও সময়ে কোন দোষ করে থাকলে তা যেন সংশোধন করে দেন। সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহাশ্রেষ্ঠীর অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করবেন; একথা বলে সম্মতি প্রদান করলেন। অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, দাস-দাসী ও দুগ্ধবতী গাভী ইত্যাদি বিশাখার সাথে দিয়ে বরযাত্রীদের বিদায় দিলেন।

### শ্বশুরালয়ে বিশাখা :

বিশাখা যথাসময়ে শ্বশুরালয়ে এসে উপনীত হলেন। মাতুলিক বাদ্যের সূতান লহরী, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে নব-বধুকে বরণ করে নিলেন শাশুড়ি ও কুলবধুগণ। নব বধুর পুণ্যলক্ষণ ও অপরূপ রূপ দেখে সকলেই বিমুগ্ধ হলো। বরযাত্রীরা বিশাখার পিতৃগৃহে বিপুল সৎকার-সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁরা অনেকে বিশাখার জন্য বহু মূল্যবান উপটোকন পাঠালেন। বিশাখা সেসব উপহার নগরবাসীকে বিতরণ করে দিলেন। এরূপ মহৎ অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়ে নগরবাসীরা বিশাখার প্রতি সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হলেন। তিনি আলাপ ও ব্যবহারে নগরবাসী সবাইকে মুগ্ধ করলেন। সেদিনই গভীর রাতে শ্বশুরের এক ঘোটকী প্রসব বেদনায় চীৎকার করছিল। তা শুনে বিশাখার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি অনতিবিলম্বে কয়েকজন দাসী সঙ্গে নিয়ে অশ্বশালায় গিয়ে ঘোটকীর বাচ্চা প্রসবে সহায়তা করলেন এবং যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা করে গৃহে ফিরে গেলেন।

### বিশাখার বিচার ও মৃগার শ্রেষ্ঠীর ত্রিশরণ গ্রহণ :

মহাকারণিক বুদ্ধ বহুকাল যাবৎ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন। কিন্তু মৃগার শ্রেষ্ঠী কোনদিন তাঁর নিকট যাননি। কারণ, তিনি ছিলেন নির্ভীক নাথপুত্রের শিষ্য। বিবাহের সপ্তম দিবসে মৃগার শ্রেষ্ঠী নির্ভীক নাথপুত্রের

শিষ্য দিগম্বর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করে আনেন। মৃগার শ্রেষ্ঠীর নির্দেশে আমন্ত্রিত গুরুজনদের বন্দনা করতে এসে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের দেখে বিশাখা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন— ‘ছিঃ! ছিঃ! এই নির্লজ্জেরা নাকি আবার শ্রমণ। এদের বন্দনা করবার জন্য কেন আমায় ডেকেছেন বাবা? তিনি ঘৃণাভরে এই কথা বলে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন। তখন দিগম্বর সন্ন্যাসিগণ শ্রমণ গৌতমের শিষ্যা এ মেয়েকে ঘরে আনার জন্য মৃগার শ্রেষ্ঠীকে তিরস্কার করে অনতিবিলম্বে তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেবার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু মৃগার শ্রেষ্ঠী তাদের অনুনয় বিনয় করে বিশাখা অজ্ঞতার জন্যই এরূপ করেছেন বলে বুঝিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং তাদের উত্তম আহার দানে পরিতৃপ্ত করেন। অতঃপর দিগম্বর সন্ন্যাসিগণ প্রস্থান করলে মৃগার শ্রেষ্ঠী পর্যঙ্কে বসে মিষ্টান্ন ভোজন করছিলেন। এমন সময় জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হস্তে দরজায় উপস্থিত হলে শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখেও না দেখার মতো আপন মনে মিষ্টান্ন ভোজনে রত রইলেন। পরিবেশন রতা বিশাখা অবস্থা-দৃষ্টে স্থবিরকে বল্লেন যে, সেখানে তিনি কিছু পাবেন না। তিনি আরো বল্লেন যে, তাঁর স্বস্তুর বাসি খাচ্ছেন।

একেত বিশাখা তাঁর স্বস্তরের আচার্যদের অপমান করেছেন, আবার তাঁকে বলছেন ‘অশুচি’ খাদক। তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, আমার সম্মুখ থেকে এই মিষ্টান্ন ফেলে দাও, আর তুমিও আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

বিশাখার বিয়ের সময় বিশাখার পিতা-মাতা মেয়ের দোষাদোষের বিচারের ভার আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত বরেছিলেন। তা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্বস্তরের কথায় মর্মান্বিত বিশাখা তাঁদের ডেকে পাঠাবার অনুরোধ জানালে মৃগার শ্রেষ্ঠী সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডেকে এনে পূর্বোক্ত অভিযোগ জানানলেন। তখন তাঁরা বিশাখার কাছে ইহার সত্যাসত্য জানতে চাইলেন। বিশাখা ঘটনাটি তাঁদের কাছে বিবৃত করে বললেন যে, তিনি তাঁর স্বস্তরের খাদ্যের শুচিতা-অশুচিতা সম্বন্ধে কিছু বলেননি, তিনি বলেছেন যে, তাঁর স্বস্তর পূর্ব জন্মের কৃতপুণ্যের ফলে লব্ধ অনুই ভোজন করছেন। এতে বিশাখার নির্দোষিতা প্রমাণিত হলে মৃগার শ্রেষ্ঠী বললেন যে, তাঁদের বাড়ীতে পাঠাবার সময় বিশাখার পিতা তাঁকে ঘরের আগুন

বের করো না, বাইরের আগুন ঘরে এনো না প্রভৃতি যে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলোও তো তাঁদের গৃহে পালন করা যাবে না। তিনি বললেন যে, প্রয়োজনে আগুন না নিয়ে বা না দিয়ে পারা যায় না। একথা শুনে বিশাখা বললেন, বাবা আপনি আমার পিতার উপদেশের অর্থ বুঝতে পারেননি দেখছি। আমি উপদেশ গুলির অর্থ একে একে বুঝিয়ে বলছি।

### উপদেশ গুলোর মর্মার্থ :

বিশাখা বললেন—

১ম উপদেশে বাবা বলেছেন, “শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী প্রমুখ শ্বশুরালয়ের পরিজনবর্গের যে-কোনো দোষের কথা আগুন সদৃশ। তাই শ্বশুর বাড়ীর কারও কোনো দোষাবহ কথা দাস-দাসীকে বা পরগৃহে গিয়ে অপরকে, এমন কি পিত্রালয়ে এসেও বলো না, এতে শ্বশুরালয়ের গৌরব ও মর্যাদা নষ্ট হয়।” (বিশাখা-শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাশুভির, পৃঃ ৬৩) পিত্রালয়ে গিয়ে না বলতে এজন্য বলেছেন যে, এতে শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামীর সাথে মাতা-পিতা ও ভাইদের অনভিপ্রেত মনোমালিন্য হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

তঁার ২য় উপদেশ ‘বাইরের আগুন ঘরে এনো না।’ বাইরের লোকের কথা শুনে তা পরিবারের লোকদেরকে বললে তাতেও পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা থাকে। তাই তিনি তা নিষেধ করেছেন।

তঁার ৩য় উপদেশ— যে দেয় তাকে দেবে। এর অর্থ, যে লোক ধার নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করে তাকেই ধার দেবার জন্য বলেছেন।

তঁার ৪র্থ উপদেশ— যে দেয় না, তাকে দেবে না। যারা ধার নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করে না, তাদের ধার দিতে নিষেধ করেছেন।

তঁার ৫ম উপদেশ— দিলে কিংবা না দিলেও দিবে। এর অর্থ, দরিদ্র ও জ্ঞাতিরা ধার পরিশোধ করতে পারুক না পারুক, তাদের ধার দিতে বলেছেন।

তঁার ৬ষ্ঠ উপদেশ— সুখে বসবে। এ উপদেশে তিনি শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের গমনাগমনের পথে না বসে অন্যত্র বসতে বলেছেন, যাতে বার বার উঠতে না হয়।

তাঁর ৭ম উপদেশ, সুখে ভোজন করবে। এ উপদেশে তিনি গুরুজনদের খাওয়ানোর পর খেতে বলেছেন।

তাঁর ৮ম উপদেশ, সুখে শয়ন করবে। গুরুজনদের শয়নের পর তিনি আমাকে শয়ন করতে বলেছেন।

তাঁর ৯ম উপদেশ, অগ্নি পরিচর্যা করবে। শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী অগ্নিতুল্য। তাই তিনি আমাকে তাঁদের পরিচর্যা করতে বলেছেন। অর্থাৎ যত্নসহকারে সেবা করতে বলেছেন।

তাঁর ১০ম উপদেশ, গৃহদেবতা নমস্কার করবে। এই উপদেশে তিনি আমাকে গৃহদ্বারে আগত সন্ন্যাসীকে খাদ্যাদি দান করতে বলেছেন।

এই উপদেশগুলির মর্ম উপলব্ধি করার পর মৃগার শ্রেষ্ঠীর সমস্ত ক্রোধ প্রশমিত হল। সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বললেন, এই উপদেশগুলি দোষণীয়ত নয়ই, বরং প্রত্যেক সুগৃহিণীর এগুলি অবশ্যই পালনীয়। তাঁরা মৃগার শ্রেষ্ঠীর নিকট জিজ্ঞেস করলেন বিশাখার আর দোষ আছে কিনা।

মৃগার শ্রেষ্ঠী যখন বললেন যে, কোন দোষ নেই, তখন বিশাখা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বললেন— আমার শ্বশুর আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বললেও আপনাদের না জানিয়ে আমি যাই নি। আমার আর এখানে থাকা চলে না। আপনারা আমার পিতৃগৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

তখন মৃগার শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে বললেন— মা, আমি অজ্ঞানতাবশত ওরূপ বলেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

প্রত্যুত্তরে বিশাখা বললেন—

আপনি আমার গুরুজন, ওরূপ বললে আমার অপরাধ হয়। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি এমন একটি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি, যে পরিবার তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমার ইচ্ছামত বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের সেবা করার অনুমতি পেলে আমি এখানে থাকতে পারি। মৃগার শ্রেষ্ঠী ইহাতে সম্মতি প্রদান করলেন। বিশাখা পরের দিন শশিষ্য বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে এনে পিণ্ডদান করলেন। অতঃপর তিনি শ্বশুরকে ধর্ম শ্রবণের জন্য আহ্বান করলেন। বুদ্ধ শশিষ্য মৃগার শ্রেষ্ঠীর ঘরে আমন্ত্রিত হয়েছেন শুনে নগ্ন সন্ন্যাসীরাও তথায় উপস্থিত হয়েছিল। তাঁরা মৃগার শ্রেষ্ঠীকে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে নিষেধ



করল। কিন্তু মৃগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে আগ্রহী হলে তারা বললো— সন্ন্যাসী গৌতম একজন মহা মায়াবী। যে ব্যক্তি তাঁকে দেখে, সে-ই তাঁর বশীভূত হয়ে পড়ে। অতএব, নিতান্তই যদি শুনতে চান, যবনিকার অন্তরাল থেকেই শুনুন। তাই মৃগার শ্রেষ্ঠী যবনিকার অন্তরালে বসেই বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে মৃগার শ্রেষ্ঠী সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন তিনি নিজেই যবনিকা সরিয়ে বুদ্ধের পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়ে বললেন— প্রভু, আমি আজীবন উপাসকরূপে আপনার, সদ্ধর্মের এবং ভিক্ষু সংঘের শরণ নিলাম। তৎপর তিনি বিশাখাকে সম্বোধন করে বললেন, আজ তুমি আমাকে ধর্মপথে নতুন জীবন দান করেছ। তাই আজ থেকে তুমি আমার ‘ধর্মমাতা’। সেদিন থেকে বিশাখার আর এক নাম হল ‘মৃগার মাতা’।

### মৃগার মাতা বিশাখা :

মৃগার শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে ‘মা’ সম্বোধন করে ‘ধর্মমাতা’ রূপে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে বিশাখা ‘মৃগার মাতা’ এ আখ্যায় আখ্যায়িত হলেন। বুদ্ধ বিশাখার নামের পেছনে ‘মিগার মাতা’ এ অভিধা সংযোগ করতেন। বিশাখা তাঁর প্রথম পুত্রের নাম রেখেছিলেন ‘মৃগার’ (পালি মিগার)

বিশাখার দ্বারা বুদ্ধের অমৃত ধর্মবাণী শুনার সৌভাগ্য লাভ করায় তিনি বিশাখার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং বিশাখাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি লক্ষ টাকা মূল্যের সব সময় ব্যবহার উপযোগী একখানা অলঙ্কার নির্মাণ করায় ‘ধর্মমাতা’ বিশাখাকে উপহার দিলেন।

### অষ্টবর প্রার্থনা :

এক বর্ষাকালে বর্ষাব্রত উদ্যাপন মানসে বুদ্ধ সশিষ্য শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বিশাখা এসে সশিষ্য বুদ্ধকে পরের দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন। কিন্তু পরের দিন ভোর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ভিক্ষুগণ বৃষ্টির জলে দেহসিক্ত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক ভিক্ষুর দেহ সিক্ত করার মত তেমন স্নান বস্ত্র অথবা দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। তাই তাঁরা উলঙ্গ হয়ে বিহারের প্রাঙ্গণে বৃষ্টি ধারায় দাঁড়িয়ে সিক্ত হচ্ছিলেন। এ দিকে আহাৰ্য বস্ত্র প্রস্তুত হলে বিশাখা বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে আনবার জন্য একজন দাসীকে বিহারে পাঠালেন।

দাসী বিহারের গেটে গিয়ে বিহার প্রাঙ্গণে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের সিঙ হতে দেখে বিশাখার নিকট ফিরে গিয়ে একথা বিশাখাকে বললে বুদ্ধিমতী বিশাখা প্রকৃত ব্যাপার বুঝে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভিক্ষুগণ বস্ত্রাভাবে তাঁদের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র খুলে রেখে নগ্নগাত্রে স্নান করতে বাধ্য হন। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভিক্ষুগণদিগকে বারবনিতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের মেয়েদের সাথে একই স্নান ঘাটে নগ্নগাত্রে স্নান করতে হয়। এ সময় নির্লজ্জ মেয়েরা ভিক্ষুগণদের প্রতি নানারূপ বিদ্রূপ করে। তিনি আরো জেনেছিলেন যে, আগন্তুক ও বিদায়ী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পৌছে বা শ্রাবস্তী থেকে বাইরে গিয়ে অন্নাভাবে কষ্ট পান। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা যথাসময়ে ঔষধ, পথ্য এবং যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার অভাবে নানারূপে কষ্ট পান। এসব লক্ষ্য করে তিনি এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য কিভাবে দান দেওয়া যায় তা স্বামী পুণ্যবর্ধনের সাথে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে বুদ্ধের অনুমতি চাইবেন। সেদিন তিনি দাসীর কাছে একথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, তিনি সেদিনই বুদ্ধের নিকট তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অনুমতি চেয়ে নেবেন।

অতঃপর তিনি চিন্তা করলেন, এ সময়ের মধ্যে ভিক্ষুগণ বৃষ্টির জলে স্নান করে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে চলে গেছেন। তাই তিনি দাসীকে আবার গিয়ে ভিক্ষুদের আহ্বান করে নিয়ে আসার জন্য পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু দাসীর যাবার আগেই শিষ্য বুদ্ধ বিশাখার গৃহদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শিষ্য বুদ্ধকে গৃহদ্বারে দেখে বিশাখার অন্তরে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার হলো। তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে সজ্জিত আসনে বসিয়ে বন্দনা করলেন এবং তৎপর খাদ্যবস্ত্র পরিবেশন করলেন। আহার-কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর বিশাখা তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করে একপ্রান্তে বসলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধকে বললেন— “ভগ্নে, আপনার কাছে আমি আটটি বর প্রার্থনা করতে চাই, করুণা পরবশ হয়ে তা’ আমাকে প্রদান করুন।

তথাগত বুদ্ধ বললেন, তথাগত বর প্রদানে অসমর্থ।

বিশাখা বললেন, ভগ্নে, যা ন্যায় সঙ্গত ও নির্দোষ, তেমন বরই প্রার্থনা করবো।

বুদ্ধ তখন বলবার জন্য সম্মতি দিলেন।

বিশাখা বললেন—

- ১। আমি ভিক্ষুগণকে আমরণ ‘বর্ষাকালীন স্নানবস্ত্র’ দান দিতে ইচ্ছা করি।
- ২। শ্রাবস্তীতে আগন্তুক ভিক্ষুগণ ভিক্ষা-স্থান জানেন না; পথও চিনেন না। তাই তাঁদের ভিক্ষাচরণ করতে কষ্ট পেতে হয়। যতদিন তাঁরা ভিক্ষাচরণ করতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের আমি আহাৰ্য-বস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।
- ৩। শ্রাবস্তী হতে দূরদেশ গমনকারী ভিক্ষুকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে খেয়ে যেতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই দূরদেশ গমনকারী ভিক্ষুকে আহাৰ্য-বস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।
- ৪। রুগ্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য দান করতে আমি ইচ্ছা করি।
- ৫। রোগীর সেবক ভিক্ষু যাতে নিরন্তর সেবা কাজেই নিযুক্ত থাকতে পারেন, সেজন্য রোগীর সেবক ভিক্ষুকে আহাৰ্য্য-বস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।
- ৬। আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে যাণ্ড দানের ইচ্ছা করি।
- ৭। আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদিগকে স্নান-বস্ত্র দানের ইচ্ছা করি।

তখন বুদ্ধ জানতে চাইলেন বিশাখার কি উপকার হবে মনে করে তিনি এই আটটি বর প্রার্থনা করলেন।

তখন বিশাখা বললেন, ভণ্ডে “একদিন না একদিন শ্রাবস্তীতে বাস করেছেন বা শ্রাবস্তীর উপর দিয়ে গমন করেছেন এমন ভিক্ষু -ভিক্ষুণীদের জীবনাবসানের পর আমি যখন জানতে পারব যে আমার কাছে একপ্রকার না একপ্রকার দান গ্রহণকারী ঐ মৃত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী বা অর্হত্বফল লাভ করেছেন, তখন আমি লাভ করব পরমানন্দ; সেই আনন্দে আমার সর্বসত্বায় বিরাজ করবে অনাবিল শান্তি। সেই শান্তিতে আমি অনুভব করব পরম সুখ, সেই সুখানুভূতি আনবে আমার চিন্তের একাগ্রতা যার ফলে আমার কর্মক্ষমতা, ধীশক্তি ও বোধ্যজ্জ সমূহের অনুশীলন হবে।” (মহামানব বুদ্ধ-অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, পৃঃ ১২৩)।

বিশাখার কথা শুনে তথাগত বুদ্ধ অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তাঁর প্রার্থীত মহৎ কাজের সম্মতি প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি এসব পুণ্য কাজের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যাণ সম্বন্ধে দেশনা করলেন। “বিশাখে, তথাগতের যেই আর্য্যশ্রাবিকা অখণ্ড শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদার ও প্রসন্ন মনে মুক্ত হস্তে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও ভৈষজ্যাদি দানীয় বস্তু অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্রে দান করে, সেই পুণ্যচেতা নারীর প্রভূত সুখ ও সৌভাগ্যের উদয় হয়। দিব্য আয়ু, দিব্য যশঃ, দিব্য ঋদ্ধি, দিব্য ঐশ্বর্য ও দিব্য সুখের অধিকারিণী হয়ে নিষ্পাপ-অনাবিল মার্গফল লাভে সে সমর্থ হয় ও দেবলোকে সুদীর্ঘকাল পরম সুখে অভিরমিত হয়।” ইত্যাদি সারগর্ভ ধর্মের বিশদ বর্ণনায় বিশাখার অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে শিষ্য বুদ্ধ চলে গেলেন। অতঃপর তিনি জেতবন বিহারে উপনীত হয়ে বিহার বাসী সমস্ত ভিক্ষুকে বিশাখার প্রার্থীত অষ্টবর সম্বন্ধে বর্ণনা করে এগুলি গ্রহণের জন্য আদেশ দিলেন।

### স্ত্রী বিশাখা :

বিশাখা ছিলেন পতিপ্রাণা। স্বামীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। স্বামীর সেবা-ব্রত সবই তিনি নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। একাধারে তিনি আহারে জননীর মতো বাৎসল্যময়ী, আদর-যত্নে ভগ্নীর ন্যায় প্রীতিদায়িনী, ভালোবাসায় সখীর মতো আনন্দদায়িনী ও পরিচর্যায় দাসীর মতো সুখদায়িনী ছিলেন।

### মহালতা প্রসাধন দান :

শ্রাবস্তীর যে-কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশাখাকে নিমন্ত্রণ করা হতো। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। কারণ, তিনি ছিলেন শীলবতী, ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধের প্রধান উপাসিকা, দায়িকা ও আর্য্যশ্রাবিকা। একদিন তিনি কোন এক উৎসবে যোগদান করে ফেরার সময় দেখলেন, দলে দলে নরনারী ধর্মশ্রবণের জন্য জেতবন বিহারে যাচ্ছেন। তখন তিনি গৃহে না গিয়ে তাদের সাথে বিহারে চলে যেতে মনস্থ করলেন। সে সময় মহালতা প্রসাধনখানি তাঁর পরিহিত ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, এভাবে অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে বুদ্ধ সমীপে যাওয়া সমীচীন হবে না। তাই তিনি মহালতা প্রসাধনখানি খুলে তাঁর প্রিয়তম দাসীর হাতে দিলেন, বললেন, এখন এটা

তোমার হেফাজতে রাখো। দাসী একখানা কাপড়ে মহালতা প্রসাধন অলঙ্কার খানা বেঁধে নিল।

ধর্মশ্রবণের পর বিশাখা বিহারের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গিয়ে ভিক্ষু শ্রমণদের দর্শন ও কার কি প্রয়োজন তা জেনে নিলেন। কারণ, তিনি প্রত্যহ ভিক্ষু-শ্রমণদের প্রয়োজনীয় জিনিস বিহারে পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর করণীয় কার্য সম্পাদনের পর তিনি গৃহে ফেরার জন্য বিহারের বাইরে এসে তাঁর প্রধানা দাসীকে ডেকে তাঁর মহালতা প্রসাধন খানা চাইলেন, পরিধান করার জন্য।

দাসী বললেন, আমি প্রসাধনখানা গন্ধ কুটিরে রেখে এসেছি। একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিয়ে আসছি। দাসী আনতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, প্রসাধনখানা স্থবির আনন্দ নিরাপদ স্থানে সামলিয়ে রেখেছেন। তখন দাসী প্রসাধনখানা না এনে বিস্তারিত বিশাখাকে জানালে বিশাখা বললেন, ওটা না এনে ভালোই করেছো। ওটা আর আমার পক্ষে ব্যবহার করা উচিত হবে না। ওটা দান করেই দেবো। অতঃপর তিনি গন্ধ কুটিরে গিয়ে তথাগত বুদ্ধকে বললেন- ভগ্নে, আমার মহালতা প্রসাধন দাসী ভুলে গন্ধ কুটিরে রেখে গিয়েছিল। পূজনীয় আনন্দ স্থবির তা ভুলে রেখেছেন। এতে আমার অপরাধ হয়েছে। এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তা আমি আপনাদের দান করছি। তখন বুদ্ধ বললেন, সংসার ত্যাগী প্রব্রজিতদের এই মহালতা প্রসাধনখানা কোন কাজে লাগবে না। তখন বিশাখা বললেন, এর বিক্রয়লব্ধ টাকা ভিক্ষুদের কাজে লাগতে পারে। তখন বুদ্ধ শারিপুত্রের সাথে পরামর্শ করে বিশাখাকে বললেন, তা'হলে মহালতা প্রসাধনের বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে শ্রাবস্তীর পূর্ব দ্বারে ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য একখানা বিহার নির্মাণ করে দাও। একথা শুনে বিশাখা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন- ভগ্নে, আমি বহুদিন যাবৎ আশা পোষণ করে আসছি যে, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান করার জন্য একটি বিহার নির্মাণ করে দেবো। অতঃপর বিশাখা বুদ্ধকে বন্দনা করে মহালতা প্রসাধনখানি নিয়ে আসলেন বিক্রয়ের জন্য।

### পূর্বরাম নির্মাণ ও দান :

বিশাখা গৃহে এসে স্বর্ণকারকে আনিয়ে মহালতা প্রসাধন খানির মূল্য নির্ধারণ করালেন। স্বর্ণকার বললো, এই মহালতা অলঙ্কার খানির মূল্য

নয় কোটি টাকার অধিক হবে। বিশাখা এটার বিক্রয়ের জন্য কর্মচারীকে শ্রাবস্তীর সর্বত্র খন্দের খোঁজার জন্য পাঠালেন। কিন্তু এত মূল্যে কেউ কিনতে চাইল না। তাই উপায়ান্তর না দেখে বিশাখা উক্ত মূল্যে নিজেই উহা কিনে নিলেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে পূর্বরাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান করলেন।

### পূর্বরাম বিহার দানে বিশাখার পুণ্য অর্জন

বুদ্ধ বলেছেন, চেতনা'হং ভিক্ষবে কস্মৎ বদামি- ভিক্ষুগণ, চেতনাকে আমি কর্ম বলি।

চেতনা তিন প্রকার - পূর্ব চেতনা, মুঞ্চ চেতনা ও অপর চেতনা।

মহাজগত জুড়ে কর্মের খেলা, কার্য-কারণ নীতি বিরাজমান। যে যেমন কাজ করে, সে সেরূপ ফল ভোগ করে।

যে কোন কাজ করার পূর্বে মানুষের মনে কর্মচেতনা উৎপন্ন হয়।

কাজ করার পূর্বে কাজ করার জন্য যে চেতনা উৎপন্ন হয়, তাকে পূর্ব চেতনা বলে। কাজ করার সময় যে চেতনা উৎপন্ন হয়, তাকে মুঞ্চ চেতনা বলে। আর কাজ শেষ হওয়ার পর তা দর্শন করে বা স্মরণ করে যে চেতনা উৎপন্ন হয়, তা অপর চেতনা। এই অপর চেতনার দ্বারা উপন্তপ্তক কর্ম শক্তিশালী হয়।

বিশাখা পূর্বরাম বিহার নির্মাণ করার পূর্বে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করার জন্য তাঁর মনে লোভ, দ্বেষ ও মোহ বর্জিত যে বিশুদ্ধ অপার আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল, তা তাঁর পূর্ব চেতনা। এই পূর্ব চেতনার প্রত্যেক চিন্তাক্ষেণেই তাঁর সঞ্চিত হয়েছিল অনন্ত পুণ্য।

এই বিহার নির্মাণ কালে ও এটা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে যাবতীয় ব্যবহারযোগ্য মহার্ঘ উপকরণ সহ দান করার সময় তাঁর মনে যে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ পরায়ণ যে বিশুদ্ধ চেতনা সঞ্চার হয়েছিল, তা মুঞ্চন বা ত্যাগ চেতনা। এই চেতনার প্রত্যেক চিন্তাক্ষেণেও তাঁর অনন্ত পুণ্য সঞ্চিত হয়েছিল।

এসব কুশল কর্ম সম্পাদনের পর তা স্মরণে ও দর্শনে প্রতিমূহূর্তে তাঁর যে চেতনা উৎপন্ন হয়েছিল, তাও ছিল লোভ, দ্বেষ ও মোহ বর্জিত। এই চেতনাকে অপর চেতনা বলা হয়। এই চেতনার প্রতিক্ষেণেও তাঁর অনন্ত পুণ্য সঞ্চিত হয়েছিল।

## উপোসথ

বুদ্ধ ছয় বছর পূর্বরাম বিহারে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধ পূর্বরামে অবস্থান কালীন সময়ে বিশাখা এক দিন উপোসথ পালনের উদ্দেশ্যে উপোসথ শীল নেয়ার জন্য দিন-দুপুরে বিহারে উপস্থিত হলে বুদ্ধ তাঁকে উপোসথ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি বললেন, উপোসথ তিন প্রকার— গোপালক উপোসথ, নির্ঘৃহ উপোসথ ও আর্যোপোসথ।

১। **গোপালক উপোসথ :** গোপালকেরা সকালে গৃহস্থের গরুগুলি ক্ষেতে (যেখানে ঘাস থাকে) নিয়ে গিয়ে সারাদিন চরিয়ে সন্ধ্যার সময় এনে গৃহস্থকে বুঝিয়ে দেয় এবং পরদিন একইভাবে এসে গরুগুলিকে মাঠে নিয়ে যায়। গোপালক সন্ধ্যার সময় গৃহস্থকে গরুগুলি বুঝিয়ে দেয়ার পর চিন্তা করে সেদিন কোন জায়গায় চরিয়ে গরুগুলি ঘাস ও পানি খেতে অসুবিধা হয়নি। আবার পরদিন কোন জায়গায় চরাবে যাতে গরুগুলোর ঘাস ও পানি খেতে অসুবিধা না হয়। তেমনিভাবে কোন কোন উপোসথিকও চিন্তা করে, উপোসথ গ্রহণের দিন কি কি খাদ্যভোজ্য খেয়েছে এবং পরের দিন কি কি খাদ্য ভোজ্য খাবে। এরূপ লোভ সহগত চিন্তে ঐ উপোসথিক সময় অতিবাহিত করে। এরূপ উপোসথই গোপালক উপোসথ নামে অভিহিত হয়। এরূপ উপোসথ মহাফলদায়ক হয় না।

২। **নির্ঘৃহ উপোসথ :** নির্ঘৃহ নামধারী একশ্রেণীর সন্ন্যাসী তাদের উপোসথিককে উপদেশ দিয়ে থাকে যে, চতুর্দিকে শত যোজনের মধ্যে তারা যেন প্রাণী হত্যা না করে, এর বাইরে হত্যা করতে পারবে। এরূপ বাক্যে উপোসথধারীকে শিক্ষা দেয়া হয়, কোনো কোনো প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আর কোনো কোনো প্রাণীর প্রতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হতে। অধিকন্তু তাদিগকে মিথ্যা বাক্যের আশ্রয়েই উপোসথ গ্রহণ ও পালন করতে উপদেশ দেয়া হয়। যেমন, উপোসথধারী দেহস্থ পোষাক-পরিচ্ছদ নিক্ষেপ করে বলে যে, সে ভৃক্ষাহীন ও উপদ্রব মুক্ত - নিজের বলতে তার কিছুই নেই। অথচ উপোসথ পালনের পরের দিন সেই ব্যক্তি আবার তার সমস্ত সম্পদই ভোগ-দখল করে। এরূপ উপোসথই নির্ঘৃহ উপোসথ। এরূপ উপোসথ পালন মহা ফলদায়ক হয় না।

৩। আৰ্যোপোসথ : ১) মানুষের চিত্ত দশ প্রকার ক্রেশের দ্বারা কলুষিত হয়। একমাত্র স্মৃতি ভাবনার মাধ্যমেই কলুষিত চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা যায়। যে সমস্ত উপোসথধারী বুদ্ধের অনন্যসাধারণ নয়টি গুণ স্মরণ করে স্মৃতি ভাবনা করে তাঁদের চিত্তের পাপমল বিদূরিত হয়। চিত্ত নির্মল ও শান্ত হয়। এরূপ উপোসথকে আৰ্যোপোসথ বলা হয়। বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকারী আৰ্যোপোসথিকের উপোসথকে 'ব্রহ্মোপোসথ' বলে।

২) আৰ্যোপোসথ পালনকারী উপাসক-উপাসিকাগণ ধর্মের ছয়গুণ স্মরণ করে স্মৃতিভাবনা করেন। এরূপ ধর্মানুস্মৃতি ভাবনাকারীর চিত্ত প্রসন্ন হয়। মনে আনন্দোৎপন্ন হয়। এতে চিত্ত ক্রেশমুক্ত হয়। এরূপ উপোসথ ধর্মোপোসথ নামে অভিহিত হয় এবং এরূপ উপোসথ পালনকারীকে ধর্মবিহারী বলা হয়।

৩) কোন কোন আৰ্যোপোসথ পালনকারী সংঘের নয়গুণ স্মরণ করে। সংঘের গুণ স্মরণে ও অনুশীলনে চিত্ত শান্ত, প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়। ফলে চিত্তের কলুষ-কালিমা বিদূরিত হয়ে চিত্ত নির্মল ও নিষ্কলুষ হয়। এই প্রকার উপোসথকে সংঘোপোসথ বলে। এই উপোসথ পালনকারীদিগকে সংঘবিহারী বলা হয়।

৪) কোন কোন আৰ্যোপোসথ পালনকারী স্বীয় অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল স্মরণ করে। শীলগুণ স্মরণে চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং ক্রেশমুক্ত হয়। এরূপ উপোসথ শীলোপোসথ নামে অভিহিত হয়।

৫) দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করলেও চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং উপক্রেশ বিদূরিত হয়। তাই আৰ্যোপোসথিকেরা দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে অবস্থান করেন।

৬) অর্হৎগণের অনুসরণ করে আৰ্যোপোসথিকেরা উপোসথশীল পালন করেন।

যেমনঃ

ক. আৰ্যোপোসথিক চিন্তা করেন যে, অর্হৎগণ প্রাণীহত্যা করেন না; সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ ও হিতানুকম্পাপরায়ণ হয়ে অবস্থান করেন। অতএব তাঁরাও সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা পরায়ণ হয়ে অবস্থান করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

খ. আৰ্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে অদন্ত গ্রহণ বা চুরি থেকে বিরত থাকার এবং যাতে চৌর্য-চিত্তও উৎপন্ন না হয়, সেরূপভাবে অবস্থান করার সংকল্প করেন।



গ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে অব্রক্ষচর্য ত্যাগ করে ব্রক্ষচর্য জীবন যাপন করেন, কামাচার থেকে দূরে থাকেন। এই শীলাঙ্গ রক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করেন।

ঘ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে মিথ্যাবাক্য ত্যাগ করে সত্যবাদী হয়ে অবস্থান করেন।

ঙ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে প্রমাদস্থানীয় সুরা, মেয়ে ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকেন।

চ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে বিকাল ভোজন থেকে বিরত থেকে পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করেন।

ছ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে নৃত্য, গীত ও বাদ্য দর্শন ও শ্রবণে বিরত থাকেন এবং বিভ্রমণ স্থানীয় মাল্য, সুগন্ধ ও বিলেপন দ্রব্য ধারণ মগুন থেকে বিরত থাকেন।

জ. আর্যোপোসথিক অর্হৎগণের অনুসরণ করে উচ্চশয়ন ও মহাশয়ন হতে বিরত থাকেন।

এভাবে আর্যোপোসথিক পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করেন।

বিশাখা মনোযোগ সহকারে উপোসথ পালনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি সম্বন্ধে শুনলেন। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের এই সারগর্ভ বাণী তিনি অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

## লোক বিজয়

বিশাখা প্রতিদিন বিকালে পূর্বারাম বিহারে এসে ধর্মদেশনা শুনতেন এবং ফিরবার সময় ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের কি কি জিনিসের প্রয়োজন তা জেনে নিয়ে দাসীদের দিয়ে তা পাঠিয়ে দিতেন। বুদ্ধ বহু বর্ষা পূর্বারামে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধ পূর্বারামে অবস্থান কালীন সময়ে বিশাখা একদিন বিহারে এসে ধর্মদেশনা শুনতে চাইলে বুদ্ধ বিশাখাকে লোক বিজয় সম্বন্ধে দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ বলেছিলেন, চার গুণে মাতৃজাতি ইহলোক বিজয় করতে পারে। সেই চার গুণ নিম্নে বর্ণিত হলো।

১। সকল কর্মে সুনিপুণা - স্ত্রীলোক যদি স্বশুর গৃহের আভ্যন্তরীণ সকল কাজে নিপুণ ও আলস্যহীন হয় এবং কুশলাকুশল কর্ম বিচার করে অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে দ্বিধাহীন চিন্তে কুশল কর্ম সম্পাদন করে, তবে তাকে কর্ম সম্পাদনে সুনিপুণা বলা হয়।

২। পরিবারের সকলের প্রতি কর্তব্যপরায়ণা—যে নারী শ্বশুরালয়ের শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীর ভাই-বোন, পোষ্য ও কর্মচারী, এমন কি চাকর-চাকরানী প্রত্যেকের কাজ-কর্ম, খাদ্য-ভোজ্য ও বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ থাকে এবং পরিবেশন কালে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ যথাযথ বিভাগ করে দেয়, তা'হলে সে নারী পরিবারস্থ সকলের মনোজ্ঞ ও প্রিয় হয়।

৩। স্বামীর সাথে মনোজ্ঞ আচরণ—যে নারী স্বামীর অমনোজ্ঞ কাজ প্রাণান্তেও করে না, সে নারী স্বামীর মনোজ্ঞ হয়।

৪। স্বামীর উপার্জিত সম্পদ সংরক্ষণ—যে নারী স্বামীর উপার্জিত সম্পদ সম্যকরূপে রক্ষা করে, ধূর্তা না হয় এবং চৌর্য-প্রকৃতির না হয়, তা'হলে সে হয় স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারিণী।

তৎপর বুদ্ধ বললেন, ১) শ্রদ্ধাপরায়ণা, ২) শীলবতী, ৩) ত্যাগবতী ও ৪) প্রজ্ঞাবতী হলে মাতৃজাতি পরলোক বিজয়ে সমর্থ হয়।

১। শ্রদ্ধাপরায়ণা নারী —যে নারী তথাগত বুদ্ধের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণা হয় অর্থাৎ বুদ্ধের যে নয়টি মহৎ গুণ, সেগুলো হৃদয়ঙ্গম করে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, তা' হলে সে হয় শ্রদ্ধাবতী।

২। শীলবতী নারী —যে নারী প্রাণী হত্যা ও চুরি করে না, ব্যভিচার হতে বিরত থাকে, সম্যক বাক্য বলে অর্থাৎ মিথ্যা, পিণ্ডন, পরুষ ও সম্প্রলাপ বাক্য থেকে বিরত থেকে সত্য, প্রিয় ও মিত বাক্য বলে এবং সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করে না, সে হয় শীলবতী নারী।

৩। ত্যাগবতী নারী —যে নারী কৃপণ না হয়ে অনুস্তর পুণ্য ক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ এবং সংপাদ্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ও দানীয় বস্তু দান করে, সে হয় ত্যাগবতী নারী।

৪। প্রজ্ঞাবতী নারী —“যে নারী সম্যক দুঃখক্ষয় গামিনী আর্য্যধর্ম অধিগত হবার মানসে উদয়-ব্যয়ে (উৎপন্ন বস্তু ক্ষয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এতে) যদি প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়, তবে সে নারী হয় প্রজ্ঞাবতী।”

(বিশাখা—শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, পৃঃ ১২৭)।

## অন্তিম জীবন :

জীবমাত্রই উদয় - বিলয় ধর্মের অধীন। অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু ক্ষয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই। মানুষ যেহেতু জীব জগতের অন্তর্গত, মানুষের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। জন্ম হলে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু অবধারিত। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, অপ্রিয়ের সংযোগ দুঃখ, প্রিয়ের বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পরিশেষে মৃত্যু দুঃখ - এই দুঃখময় জীবন প্রবাহের নামই মানব জীবন। বার বার জন্ম মানে বার বার দুঃখের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া। জন্ম নিরোধের দ্বারাই এই দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। এই জন্ম নিরোধের তথা দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ তথা উপায় হল আর্য় অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করে জীবন যাপন করা। আর্য় অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে জীবন যাপনের মাধ্যমে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও পরিশেষে অর্হত্ব ফল লাভ করতে পারলে জন্ম নিরোধ তথা নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

বিশাখা অতি অল্প বয়সেই স্রোতাপন্ন হয়েছিলেন। তাই ব্যাধি, শোক ও জরা ইত্যাদি তাঁকে দুঃখ দিতে পারেনি। তিনি মানসিক ও শারীরিক ভাবে এত সুস্থ ও সবল ছিলেন যে ব্যাধি, শোক ও জরার কবলে পড়লেও তা তার দেহ ও অন্তরে দুঃখ উৎপন্ন করতে পারেনি। কেননা, “স্রোতাপন্নের যে অমৃতময় সুখ যে অনাবিল নৈর্বাণিক শান্তি এবং লোকোত্তর মার্গফলের যে অফুরন্ত আনন্দ, তাতেই তিনি নিরন্তর নিমগ্ন থাকতেন আপন হারা হয়ে।” (বিশাখা- শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির-পৃঃ ১৩০)

তিনি সাবলীল ও স্বাভাবিকভাবে নিজের দান-শীল-ভাবনা ও পারিবারিক-সামাজিক কাজ করে গেছেন। “আপন সম্ভান-সম্ভতি হোক আর ভিক্ষুসংঘ হোক অথবা দীন দুঃখীই হোক, সকলের জন্যই বিশাখা ছিলেন মাতৃসমা। মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করতেন সকলকে। দান-শীলাদি বিবিধ পুণ্য কর্মে নিজকে উৎসর্গ করে দিয়ে সতত উপভোগ করতেন তিনি অনুপম প্রীতি।” (বিশাখা - শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির) তাই বিশাখা ছিলেন সর্বতোভাবে সুখী। তাঁর পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী সবাই ছিলেন সুন্দর, সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান-স্বাস্থ্যবতী। অতএব তিনি যেমন ছিলেন ঐশ্বর্যশালিনী, তেমনি তিনি জন-গৌরবেও ছিলেন গৌরবান্বিতা।

বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধসংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। এই মহিয়সী পুণ্যবতী নারী মহোপাসিকা অগ্রশ্রাবিকা বিশাখা ১২০ বছর বয়সে পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন সকলকে শোকাভিভূত করে সজ্ঞানে স্বকীয় স্রোতাপত্তি ফল-চিন্তের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে করতে দেবলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করতঃ দেহত্যাগ করেন।

---

## বৌদ্ধ কর্মবাদ

অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বুদ্ধ বলেছেন, “চেতনা’হং ভিক্ষবে কম্মং বদামি, চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায়, মনসা।”-‘হে ভিক্ষুগণ, চেতনাকে আমি কর্ম বলি, চেতনা সহকারে অর্থাৎ ইচ্ছা করেই প্রাণীর কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম করে থাকে।’ প্রাণীর মনে প্রথমে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। তৎপর প্রাণী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মন দ্বারা কর্ম করে থাকে। যখন হাঁটবার বা কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তখন মানুষ পা দিয়ে হাঁটে, কথা বলার ইচ্ছা হলে মুখ দিয়ে কথা বলে, লিখবার ইচ্ছা হলে উপকরণ নিয়ে হাত দিয়ে লিখে। ইচ্ছানুযায়ী দেহ তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথা কাজ সম্পাদন করে। আবার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মনও কর্ম করে থাকে। যেমন, মনে মনে কারো শুভ কামনা, কখনওবা অশুভ কামনা, আবার কখনওবা মনে মনে গালি দেওয়া ইত্যাদি শুভাশুভ কর্ম করে থাকে। এভাবে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। অতএব, চেতনা বা চিন্তা তথা মনই প্রাণীর সর্ব কর্মের নিয়ন্তা। এই চেতনা তথা ইচ্ছা ছাড়া যে সমস্ত কর্ম কখনও কখনও সম্পাদিত হয়ে থাকে সেগুলো তেমন গুরুত্ববহ নহে। ধম্মপদের প্রথম গাথায় বলা হয়েছে-

মনোপুস্পংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পদুটঠেন ভাসতি বা করোতি বা,  
ততো নং দুক্কমম্বেতি চক্কং ব বহতো পদং।  
মনোপুস্পংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া,  
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,  
ততো নং সুখমম্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী।

মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বকর্ম মনোময় অর্থাৎ মনের দ্বারা সংগঠিত হয়। যদি কেউ দোষযুক্ত মনে (পরের অনিষ্ট চিন্তা করে) কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে শকটবাহীর (বলদের) পশ্চাদনুগামী চাকার ন্যায় দুঃখ তার অনুগামী হয়। মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বকর্ম মনোময় অর্থাৎ মনের দ্বারা সংগঠিত হয়। যদি কেউ প্রসন্ন মনে কোন কথা বলে বা কাজ করে, তবে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার মত সুখ তার অনুগামী হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের ছয়টি ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনের সাথে অর্থাৎ ষড়ায়তনের সাথে বহিরায়তন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শ ও মনের ধর্ম ইত্যাদির সংযোগের ফলে মনে প্রথমে চেতনা বা ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই মানুষ কায়, বাক্য ও মন এই তিনটির মাধ্যমেই কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে থাকে। কায়ের দ্বারা ৩ প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন, ১) প্রাণীহত্যা, ২) চুরি করা, ৩) ব্যভিচার করা। বাক্যের দ্বারা ৪ প্রকার অকুশল কর্ম

সম্পাদিত হয়। যেমন ১) মিথা কথা বলা, ২) কটু কথা বলা, ৩) পিশুন বা ভেদ বাক্য বলা ও ৪) সম্প্রলাপ বা বাজে কথা বলা। আর মনের দ্বারা ৩ প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন ১) লোভ ২) দ্বেষ ৩) মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া। আবার, কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা বহু কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মে কর্মফল স্বয়ংক্রিয়। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে; পানিতে হাত দিলে হাত ভিজবে, পাথরে মুঠাঘাত করলে হাতে ব্যথা পাবে। আগুনে জল ঢাললে আগুন নিভে যাবে; একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদে সাহায্য করলে সেও সাহায্যকারীর বিপদে সাধ্যমত সাহায্য করবে। এর পরোক্ষফলও আছে। কর্মের ক্রিয়াশলীতা বা ফলদাত্রী হিসেবে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ- ১) জনক কর্ম, ২) উপন্তম্বক কর্ম, ৩) উৎপীড়ক কর্ম ও ৪) উপঘাতক কর্ম।

১. জনক কর্মঃ কোন জীবের মৃত্যু মুহূর্তে তার সে জন্ম ও পূর্ব জন্মে সম্পাদিত যে কর্মচেতনা প্রাধান্য বিস্তার করতঃ ভাবী জীবনের প্রতিসন্ধি বা উৎপত্তি ঘটায় তাকেই জনক কর্ম বলা হয়। এই জনক কর্ম কুশল এবং অকুশল উভয়ই হতে পারে। কুশল হলে সে সৎ পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়ে উত্তরোত্তর উন্নত জীবন লাভ করবে। আর অকুশল হলে সে অসৎ পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়ে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করবে; বেশি অকুশল কর্ম করলে তির্যক কূলে জন্ম নিতে বাধ্য হবে।

২. উপন্তম্বক কর্মঃ উপকারী বা সাহায্যকারী কর্মকে উপন্তম্বক কর্ম বলে। ইহা পূর্ব চেতনা বা জনক কর্মকে সহায়তা করে। ইহাও কুশলাকুশল উভয়ই হতে পারে। কুশল জনক কর্মের উপন্তম্বক কর্ম প্রাণীকে উন্নত জীবনের দিকে এগিয়ে দেয়। আবার অকুশল উপন্তম্বক কর্ম দ্বারা হীন কূলে জন্মগ্রাণ প্রাণীকে আরো নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত করে।

৩. উৎপীড়ক কর্মঃ উৎপীড়ক কর্ম হল অন্তরায়কর কর্ম বা প্রতিকূল কর্ম। এই কর্ম জনক কর্ম ও উপন্তম্বক কর্মকে ফলোৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। ইহাও কুশলাকুশল হতে পারে। ইহা কুশল জনক কর্মকে বাধা দিয়ে কুশল কর্মের ব্যাঘাত ঘটায়। আবার অকুশল কর্মকে বাধা দিয়ে প্রাণীর উপকার সাধন করে। কুশল কর্মের উৎপীড়ক কর্ম যেমন মানুষের ক্ষতি সাধন করে, তেমনি অকুশল কর্মের উৎপীড়ক কর্ম মানুষের উপকার সাধন করে। যেমন, একজন দাতাকে দান কার্যে নিরুৎসাহিত করে দান কার্য হতে বিরত রেখে পুণ্য অর্জনে বাধা দেয়; অপর দিকে একজন ঘাতককে প্রাণ হননে বাধা দিয়ে পাপ কর্ম থেকে বিরত রেখে উন্নত জীবন যাপনে প্রণোদিত করে।

৪. উপঘাতক কর্মঃ ইহা জনক কর্মকে সমূলে উৎপাটিত ও ধ্বংস করে। ইহাও কুশল এবং অকুশল দুই-ই হতে পারে। ইহা জনক কুশল কর্মকে ধ্বংস করে অকুশল কর্মের উৎপত্তি ঘটায়। অপর পক্ষে জনক অকুশল কর্মকে ধ্বংস করে কুশল কর্মের উৎপত্তি ঘটায়। যেমন, একজন সৎ লোকের ছেলে অসৎ সংসর্গে কু-কাজে লিপ্ত হওয়া, অপরপক্ষে একজন অসৎ লোকের ছেলের সৎসংসর্গে অথবা সৎ গুরুর সান্নিধ্যে সৎ চরিত্রবান হয়ে সৎ কাজে নিয়োজিত হওয়া।

কতকগুলো কর্ম আছে, যেগুলো শীঘ্র ফলদান করে। আর কতকগুলো কর্ম আছে,

যেগুলো দেরীতে ফলদান করে। কর্মের এই ফলদানের ক্রম অনুসারে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ ১. দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম (দিট্ঠ ধম্ম বেদনীয় কম্ম), ২. উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম (উপপজ্জ বেদনীয় কম্ম), ৩. অপরপর্যায় বেদনীয় কর্ম (অপরাপরিয় বেদনীয় কম্ম) ও ৪. অশক্ত কর্ম (অহোসি কম্ম)।

**১. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মঃ** যে কর্মগুলো সম্পাদনের সাথে সাথেই অথবা কিছু সময় পর হলেও ইহ-জন্মেই সু-কর্মের সুফল ও কু-কর্মের বিপাক বা দুঃখ প্রদান করে, সেগুলোকে দৃষ্ট ধর্ম বেদনীয় কর্ম বলা হয়। এই কর্মগুলো বিপরীত কর্মের ফলশ্রুতিতে অর্থাৎ অকুশল কর্মের বিপরীতে কুশল কর্ম, আবার কুশল কর্মের বিপরীতে অকুশল কর্ম অথবা অন্য কোন কারণে ফলদানে ব্যর্থ হলে কার্যকারিতা হারিয়ে বন্ধা হয়ে যায়। তবে এরূপ খুব কমই হয়। মানুষের কর্মের ফল অমোঘ। তাই কখনই অকুশল কর্ম করা উচিত নয়। সব মানুষকে সতর্ক তথা সচেতন থাকতে হয়। কেউ কেউ মনে করে অজান্তে অকুশল কর্ম সম্পাদিত হলে পাপ হয় না। এটা সত্য নয়। শরীরের কোন অংশে অজান্তে আঙুল লাগলে বা এসিড লাগলে ঐ অংশটা কি পুড়ে যায় না? অতএব মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে অর্থাৎ জ্ঞানতে হবে কোন কাজটা কুশল আর কোন কাজটা অকুশল।

**২. উপপাদ্য বেদনীয় কর্মঃ** যে কর্মগুলো পরবর্তী জন্মে ফলদান করে, সেগুলোকে উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম বলা হয়। ইহাও দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মের ন্যায় পরবর্তী জন্মে ফলদানে ব্যর্থ হলে কার্যকারিতা হারিয়ে বন্ধা হয়ে যায়। ইহাও কুশলাকুশল দুই-ই হতে পারে।

**৩. অপরপর্যায় বেদনীয় কর্মঃ** যে কর্মগুলো দেরীতে ফলদান করে অথচ অমোঘ অর্থাৎ যেসব কু-কর্মের কুফল কেউ এড়াতে পারে না, আবার যেসব সু-কর্মের সুফল থেকে বঞ্চিত করা যায় না, এরূপ কর্মগুলোকে অপরপর্যায় বেদনীয় কর্ম বলা হয়। এগুলো তৃতীয় জন্ম থেকে যে কোন জন্মে ফলদান করে।

**৪। অশক্ত কর্ম :** কতকগুলো কর্ম আছে যেগুলো নানা কারণে ফলদানে অসমর্থ সেগুলোকে অশক্ত কর্ম বা অহোসি কর্ম বলা হয়। এসব কর্ম স্বাভাবিক দুর্বলতা বা উৎপীড়ক বা উপঘাতক কর্ম কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফলদানে অসমর্থ হয় অর্থাৎ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু অপরপর্যায় বেদনীয় কর্ম ও গুরু কর্ম কখনো কার্যকারিতা হারায় না। তাই এগুলো কখনো অশক্ত কর্মে পরিণত হয় না।

যারা অর্হত্ত্ব স্তরে উন্নীত হতে পারেননি এবং অন্য যারা পৃথক জন তাদের পক্ষে ইহজন্ম ছাড়া অন্যান্য জন্ম বৃত্তান্ত জানা সম্ভব নয়। তবে আমরা চেষ্টা করলে কিছুটা অনুধাবন করতে পারি। দেখা যায়, কোন কোন লোক এ জন্মে তেমন কুশল কর্ম না করেও সুখ ভোগ করে। যেমন বিশাখার স্বস্তর মৃগার শ্রেষ্ঠী পূর্বজন্মের অর্জিত পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠী হয়ে সুখ ভোগ করছিলেন বলে বিশাখা বলেছিলেন। আবার কতকগুলো লোক কুশল কর্ম করার পরও দুঃখ ভোগ করে। কখনো কখনো লোক মুখে শোনা যায়, অমুক লোকটি কখনো অনায়াস করতে দেখিনি। তবুও এত কষ্ট পাচ্ছে কেন বা এত কষ্ট পেয়ে মারা গেল কেন? আবার কোন কোন লোক বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এগুলো

উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম বা অপরপর্যায় বেদনীয় কর্মের ফল বৈকি।

আবার কর্মের নিজস্ব প্রকৃতি হিসেবে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ (১) গুরুকর্ম, (২) আসন্ন কর্ম, (৩) আচরিত কর্ম ও (৪) উপচিত কর্ম।

১। **গুরু কর্মঃ** এই কর্মগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী। এরূপ একটি অকুশল গুরুকর্ম সারা জীবনে সম্পাদিত অন্য বহু কুশল কর্ম দ্বারা সঞ্চিত পুণ্যফলকে নষ্ট করে দিয়ে বিপাক দিতে আরম্ভ করে। যেমন, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত এবং সংঘভেদ এই পাঁচটি গুরুকর্মের যে কোন একটি সংঘটিত হলেই মানুষ অসীম দুঃখে পতিত হয়। এমন কোন কুশল কর্ম নেই যে কর্ম এসব গুরু কর্মের বিপাককে বাধ্যস্ত করতে পারে। অপর দিকে কুশল গুরুকর্ম বহু অকুশল কর্মের বিপাককে বাধ্যস্ত করতে পারে। যেমন, শমথ ও বিদর্শন ধ্যানের মাধ্যমে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষ পাঁচটি গুরু কর্ম ছাড়া অন্যান্য বহু অকুশল কর্মের বিপাক হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। তবে কতগুলো অকুশল কর্মের বিপাক ভোগ করে নির্বাণ লাভ করতে হয়। যেমন, মোগ্গলায়নকে নির্বাণ লাভের পূর্বে অতীত জন্মের অকুশল কর্মের কুফল হেতু গুণ্ডাদের হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

২। **আসন্ন কর্মঃ** গুরুকর্ম ব্যতীত অন্য যে সব কর্ম মুমূর্ষু জীবের মৃত্যুর পূর্বক্ষেণে সম্পাদিত হয়, সেগুলোকে আসন্ন কর্ম বলা হয়। এই আসন্ন কর্ম কুশল হলে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী উন্নত কূলে ও সং পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে আর অকুশল হলে হীনকূলে ও অসং পিতা-মাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে। অন্ধকার রাতে ক্ষুদ্র প্রদীপও যেমন যাত্রীর যাত্রাপথে সহায়তা করে, সেরূপ একটি ক্ষুদ্র কুশল চেতনা তথা কুশল কর্ম মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে সুগতিলাভে সহায়তা করে। এ জন্য মুমূর্ষু মানুষকে তৎ কর্তৃক সম্পাদিত কুশল কর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও ধর্ম কথা শ্রবণ করানো উচিত।

৩। **আচরিত কর্মঃ** আমরা দৈনন্দিন যে সমস্ত কর্ম করি, তন্মধ্যে কতকগুলি কুশল কর্ম, আর কতকগুলি অকুশল কর্ম। যেমন, সত্য কথা বলা কুশল কর্ম, আবার মিথ্যা কথা বলা অকুশল কর্ম। শিক্ষার জন্য ও ধর্মনীতি পালনের জন্য উপদেশ দেওয়া কুশল কর্ম। অন্যের প্রয়োজনে সহায়তা করা কুশল কর্ম। অপর দিকে চুরি করা ও অন্যকে ঠকিয়ে লাভবান হওয়া অকুশল কর্ম। যদিও এ সমস্ত অকুশল কর্ম ৫টি গুরুকর্ম ও প্রাণীহত্যা এবং নেশাশস্ত হওয়ার মত বড় রকমের অকুশল কর্ম নহে, তবুও এভাবে এ কাজগুলো করতে করতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। একজন সত্যবাদী লোক বিপদে পড়লে কখনও অসতর্ক মুহূর্তে মিথ্যা কথা বললেও, সে সব সময় সত্য কথা বলার চেষ্টা করে থাকে। আবার মিথ্যাবাদী লোক অপ্রয়োজনেও মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। এ ভাবে মিথ্যা কথা বলতে বলতে তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আবার সত্য কথা বলতে বলতে সত্য কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য এগুলোকে আচরিত কর্ম বলা হয়। গুরু কর্ম ও বড় রকমের অকুশল কর্ম (যেমন, মানুষ হত্যা ও নেশাশস্ত হওয়া ইত্যাদি) খুব কম লোকই সম্পাদন করে থাকে। তাই কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া সব মানুষেরই আচরিত কর্ম আসন্ন কর্মরূপে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ আচরিত



কর্ম কুশল হলে উর্ধগতি আর আচরিত কর্ম অকুশল হলে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। যেমন, একজন সৎ ডাক্তার ও সৎ শিক্ষকের জীবন উর্ধগতি প্রাপ্ত হবে। আবার একজন ব্যাধ ও সাপুড়ের জীবন নিম্নগতি প্রাপ্ত হবে। তাই কুশল কর্ম সম্পাদন করা অভ্যাসে পরিণত করা উচিত।

৪। উপচিত কর্মঃ ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, কোন কর্মই বৃথা যায় না, যদি না ইহা উৎপীড়ক বা উপঘাতক কর্ম দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বন্ধ্যাত্তপ্রাপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকুশল কর্ম চিত্ত গর্ভে সঞ্চিত হয়ে যখন শক্তিশালী হয় এবং ফলদান করে, তখন এগুলোকে উপচিত কর্ম বলা হয়। তেমনি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশল কর্ম সঞ্চিত হয়ে সুফল প্রদান করে। কোন অকুশল কর্মকে ক্ষুদ্র ভেবে অবহেলা করা উচিত নহে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র হলেও অকুশল কর্ম করা উচিত নহে। অপরদিকে, ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক সব সময় কুশল কর্ম সম্পাদনে মনোযোগী হওয়া উচিত।

“বুদ্ধ মহামঙ্গল সূত্রে বলেছেন, “পূর্বে চ কতপুণ্ড্রতা এতং মঙ্গলমুত্তমং”— পূর্ব জন্মে উপচিত পুণ্যই মহাকল্যাণজনক হয়।” (বিশাখা শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাশ্বির পৃঃ ৪৮) বস্তুতঃ বিশাখা পূর্ব জন্মের সঞ্চিত উপচিত কর্মের প্রভাবেই মহালতা প্রসাধন অলঙ্কার লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে।

কেউ কেউ মনে করে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলে ঈশ্বর পাপ থেকে মুক্ত করে দেন; অর্থাৎ কু-কর্মের বিপাক এড়ানো যায়। এটা ভুল ধারণা। জেনে হোক, অজান্তে হোক, দেহের যে কোন অংশে আগুন লাগলে দেহের সে অংশ দক্ষীভূত হবেই। ঈশ্বরের কাছে বা অন্য কোন ইষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করে আগুনের দাহিকা শক্তি নষ্ট করা যাবে না। অবশ্য দক্ষ ক্রিয়া কিছুটা প্রশমিত করা যায়। যেমন, জ্বলা, পোড়া ইত্যাদিতে এক প্রকার দ্রব্য (যেগুলো আমরা ঔষধরূপে ব্যবহার করি) ব্যবহারের মাধ্যমে। সেরূপ কোন কু-কর্ম করলে তার বিপরীত সু-কর্ম করে কু-কর্মের বিপাক কিছুটা প্রশমিত করা যায় বৈকি। যেমন, কোন একজন মানুষের ক্ষতি করলে বা কোন মানুষকে আঘাত করলে অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ও তার উপকার করে ঐ কু-কর্মের কুফল বা বিপাক কিছুটা কমাতে পারে। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ঘরে বসে ইষ্টদেবতার প্রার্থনা বা ইষ্টদেবতার নাম জপ করে আগুন নেভানো যায় কি? তখন ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিতে হয় এবং ঘর থেকে বের হয়ে পানি দ্বারা আগুন নেভাতে লেগে যেতে হয়। তদ্রূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য শিল্প-বাণিজ্য, চাকুরী করতে হয়। কেউ কেউ দুর্নীতি করে টাকা রোজগার করে কিয়দংশ টাকা দান-ধর্মে ব্যয় করে মনে করে যে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া গেল। এটাও ভুল ধারণা। দুর্নীতি করে রোজগার করা সম্পূর্ণ টাকা দান-ধর্মে ব্যয় করেও পাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। অপ্রতিরূপ পরিবেশে অনেক সৎ লোক নিজেদের সততা রক্ষা করতে অসুবিধায় পড়ে। যেমন, একটি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ঘুষ নিয়ে বা সরকারী সম্পত্তি বা রিলিফের মালামাল বিক্রী করে লব্ধ টাকা সবাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। এ ক্ষেত্রে কেউ না নিলে তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়। চাকুরী হারানো এমনকি অবস্থাক্ষেত্রে জীবন

বিপন্ন হওয়ারও আশংকা থাকে। এমতাবস্থায় কোন কোন সং লোক দুর্নীতির দ্বারা উপার্জিত টাকা দান-ধর্মে ও জনহিতকর সং কাজে ব্যয় করে পাপমুক্ত হয়েছে মনে করে থাকে। দুর্নীতি করে উপার্জিত সব টাকা দান-ধর্মে ব্যয় করেও পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। দুর্নীতি করবার সময় যদি সে ধরা পড়ে যায়, তাহলে দুর্নীতির টাকা দান-ধর্মে ব্যয় করার জন্য দুর্নীতি করেছে-একথা বললে কি তাকে শাস্তি ভোগ থেকে রেহাই দেয়া হবে? আবার দান ধর্মে ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার পরও যদি দুর্নীতি ধরা পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত সংকাজে দুর্নীতির টাকা ব্যয় করেছে একথা বললে কি সরকার বা হাইকোর্ট তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেবে? কখনোই না। ইহলোকে পুলিশ, গোয়েন্দা বা মানুষকে ফাঁকি দেয়া গেলেও বা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্নীতি করা গেলেও পরলোকে দেবতাদের দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হয় না। অধিকন্তু নিজের চিন্তা গর্ভে সঞ্চিত এসব অকুশল সংস্কার চিন্তকে পীড়া দিতে দিতে চিন্তকে দুর্বল ও রুগ্ন করে তোলে। অতএব কোনরূপ অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়াই বুদ্ধিমানের উচিত।

## পরিশিষ্ট-২ সম্যক চেতনা

১. 'বিক্ষিপ্ত চিন্তা নেকগুণো সম্মা ধম্মং ন পসসতি  
অপসসমানো সঙ্কম্মং দুঃখা ন পরিমুচ্চতি।'

-যাদের চিন্তা বিক্ষিপ্ত তারা একাগ্রতাহীন; তারা সম্যক ধর্মকে দেখতে পায় না। সঙ্কম্মকে দেখতে পায় না বলে তারা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

এই গাথার প্রথম লাইনে 'সম্মা ধম্মং ও দ্বিতীয় লাইনে সঙ্কম্মং' বলা হয়েছে। দুটোই সমার্থক শব্দ।

Pali Text Book Society's: Pali-English Dictionary বইতে Samma (সম্মা) অর্থ thoroughly, properly, rightly, in the right way, as it ought to be best, perfectly, usually as, like sammadhara even or proper showers; especially in connection with constituents of the eight fold Aryan path where it is contrasted with miccha.

সূত্রাং সম্মা ধম্ম অর্থ সম্যক ধর্ম, বাস্তব ধর্ম, সত্য ধর্ম, সঠিক ধর্ম অর্থাৎ যথার্থ ধর্ম, বিশেষ করে, আর্থ-অষ্টাঙ্গিক মার্গের গঠনকারী আটটি অঙ্গ বা অংশগুলোয় বর্ণিত আচরণ-বিধি। যেমন, (১) সম্মা দিট্ঠি (২) সম্মা সঙ্কম্পো, (৩) সম্মা বাচা, (৪) সম্মা কম্মন্তো, (৫) সম্মা আজীবো, (৬) সম্মা বায়ামো, (৭) সম্মা সতি ও (৮) সম্মা সমাধি। এগুলোকে জানাই তথা অনুশীলন করাই 'সম্মা ধম্মং' পসসতি। চিন্তা একাগ্র না হলে এগুলো অনুশীলন করা সম্ভব হয় না। আমাদের জীবন হল জড় ও চেতনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রবাহ অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত আমাদের এ দেহ একটি জীবন প্রবাহ। আমাদের শরীরের মাটি, জল, তেজ (উষ্ণতা ও শীতলতা) এবং বায়ু এ চারটি পদার্থকে রূপ বলা হয়। রূপের অপর নাম চার মহাভূত। রূপ জড় পদার্থ। রূপ নিত্য পরিবর্তনশীল। আর চেতন পদার্থ হল 'নাম'। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চার

ক্ষণকে 'নাম' বলা হয়। নামও নিত্য পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীল নাম ও রূপের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তনশীল নাম ও রূপ সমন্বিত জীবনপ্রবাহ যে কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে। রূপ যে কোন ঘটনা বা কার্য-কারণে অকার্যকর হলে নাম নতুন রূপের অঙ্কুরোদগম করে বর্তমান রূপকে ত্যাগ করতে পারে অর্থাৎ প্রতিসন্ধি গ্রহণ করার পরক্ষণেই দেহত্যাগ করে থাকে। অতএব 'নাম-রূপ' অনিত্যধর্মী। এর মধ্যে নিত্য, ধ্রুব, অবিনশ্বর আত্মা বলে কিছু নেই। কেননা, যে 'নাম' নতুন রূপ নিয়ে নতুন জীবনপ্রবাহের সূচনা করে সে 'নাম' আর পূর্ব রূপে যে 'নাম' ছিল দুই 'নাম' একও নহে আবার ভিন্নও নহে। বস্তুত চিন্তায়, চেতনায় ও কর্মে 'নাম' পরিবর্তন হয়ে যায়। উপনিষদের ঋষিদের অভিমত- আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, অজর, অমর ও অক্ষয়। বুদ্ধ জীবদেহে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, অজর, অমর ও অক্ষয় এমন কিছু দেখতে পাননি। অতএব আমাদের দেহ ও মন অর্থাৎ নাম-রূপ অনাত্ম ও পরিবর্তনশীল। তাই দুঃখময়। আমাদের দেহ ও মনের তথা নাম-রূপের এই যে যথার্থ ধর্ম-(অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা) তা সম্মা ধর্ম-সম্যক ধর্ম। অধিকন্তু নাম-রূপ এবং প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনা প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্মী অর্থাৎ কার্য-কারণ নীতি ভিত্তিক। ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্ উৎপাদো ইদং উৎপাদ্যতি, ইমস্ নিরোধ ইদং নিরুদ্ধতি। যেমন, অবিদ্যা হতে সংস্কার, সংস্কার হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হতে নাম-রূপ, নাম-রূপ হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হতে স্পর্শ, স্পর্শ হতে বেদনা, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান, উপাদান হতে ভব, ভব হতে জাতি (জন্ম), জাতি হতে জরা-মরণ, শোক-পরিদেবন দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করতে হয়। আবার অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ..... দুঃখের নিরোধ ইত্যাদি। এই সম্যক ধর্ম জানাই হল 'পস্ সনা'। 'পস্ সনা'র সত্যিকার অর্থ হল সঠিকভাবে বুঝা বা মনের একাগ্রতার মাধ্যমে জানা, নাম-রূপের তিনটি বৈশিষ্ট্য অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা\* এবং কার্য-কারণ নীতি যথাযথভাবে জানা। প্রতিটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয়ের এইসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এসব বৈশিষ্ট্যকে জানলেই দশ প্রকার ক্লেশ (লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, অহী ও অনুপত্রপা) এবং দশ প্রকার সংযোজন (সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা) দূর করে মুক্তির সোপানে পৌছা সম্ভব। 'ন পসসতি অর্থ দেখতে পায় না। অর্থাৎ জানতে না পারা। 'অপস্ সমানো' না দেখা, না জানা। অর্থাৎ অজ্ঞাতা তথা অবিদ্যা। সুতরাং সম্যক ধর্মকে না জানলে কিভাবে দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব? আর সদ্ধর্ম হলো সৎ ধর্ম, সত্য ধর্ম, যথার্থ ধর্ম, বাস্তব নীতি ভিত্তিক ধর্ম। চার আর্থ সত্যকে জানা অর্থাৎ সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়াই সদ্ধর্মকে জানা। জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হয়। এই দুঃখ নিরোধ করা যায়। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন। এই সত্যকে জানা 'সদ্ধর্ম্যং পস্ সতি'। এরূপ সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মকে জানা সদ্ধর্মকে দেখা বা জানা। বুদ্ধের প্রচারিত জীবন সত্য

\*যেহেতু আমরা আত্মায় বিশ্বাস করিনা, তাই প্রয়াত ব্যক্তির স্মরণ সভায় প্রয়াত ব্যক্তির আত্মার সদগতি কামনা করা উচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়াত ব্যক্তির পারলৌকিক সদগতি বা সুগতি অথবা পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করাই যুক্তিযুক্ত।

তথা সৎ নীতিগুলোকে ‘সদ্ধর্ম’ বলা হয় এবং এই সৎ নীতি পালনকারীদিগকে সদ্ধর্মী বলা হয়। বৌদ্ধধর্মকে সদ্ধর্ম এবং বৌদ্ধদেরকে যে সদ্ধর্মী বলা হত তা আমরা ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার নিম্নোক্ত লেখা থেকেও জানতে পারি। ‘রামাই পণ্ডিতের শূন্য পূরণ ও ধর্ম মঙ্গল সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। শূন্য পূরণের অন্তর্গত নিরঞ্জনের রুম্মায় সদ্ধর্মীদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের পরিচয় আছে—

‘মালদহে মাগে কর না চিনে রাপন পর

জালের নাট্রিক দিসপাস

বলিষ্ঠ হয়্যা বড় দসবিস হয়্যা জড়

সদ্ধর্মিরে করহ বিনাস।’

এর ফলে ধর্মঠাকুর যবন বেশ ধারণ করে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, কোন ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেবমন্দির ইত্যাদির উপর উৎপাত দর্শনে হুঁট হইয়াছিলেন, তাহা বোঝা যাইতেছে।’ অতএব সদ্ধর্ম হল সৎ নীতির ধর্ম। শীল-সমাধি প্রজ্ঞা তথা সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম হল সদ্ধর্ম। যেহেতু সৎ ও বাস্তব নীতি বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি, তাই বৌদ্ধধর্মকে সদ্ধর্ম বলা হয়।

হিন্দুদের একটি সম্প্রদায় বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মকে সদ্ধর্ম এবং নিজেদের আচরিত ধর্মকে ‘সনাতন ধর্ম’ বলে দাবী করে থাকে। সনাতন অর্থ চিরন্তন। কিন্তু বুদ্ধ বললেন যে, বুদ্ধের প্রচারিত সৎ ও বাস্তব নীতিই হল সনাতন। যা সদ্ধর্ম তাই সনাতন তথা চিরন্তন ধর্ম। গীতা ও ধর্মপদের কয়েকটি গাথার তুলনা করলে আমরা বুদ্ধের কথার সত্যতা বুঝতে পারবো। গীতায় বলা হয়েছে—

সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যা মোক্ষয়ামি মা শুচ। ১৮-৬৬

সরলার্থ— সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকে ভজনা কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। শোক করো না।

ধর্মপদের মগ্গগো বর্ণে বলা হয়েছে—

মগ্গানট্টঙ্গিকো সেট্টো, সচ্চানং চতুরো পদা,

বিরাগো সেট্টো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্কুমা।

এসো ব মগ্গগো নথএএএয়া দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া,

এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্সেতং পমোহনং।

এতং হি তুম্হে পটিপন্না দুক্কস্সসন্তং করিস্সথ,

অক্খাতো বে ময়া মগ্গগো অএএয়ায় সন্তস্সনং।

তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা,

পটিপন্না পমোক্কন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।

বজ্ঞানবাদ— মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্য সত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদগণের মধ্যে চক্কুশ্মানই শ্রেষ্ঠ। দর্শন বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই অষ্ট অঙ্গ সমন্বিত

মার্গই একমাত্র মার্গ বা পথ। অন্য পথ নেই। তোমরা এই মার্গ অবলম্বন কর। ইহা মারকে সম্মোহিত করে।

এই মার্গ অনুসরণ করে তোমরা দুঃখের অন্ত করবে। দুঃখ (শল্য) উৎপাতনের উপায় জেনেই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছি। উদ্যম তোমাদিগকেই করতে হবে। তথাগতগণ ধর্ম ব্যাখ্যাতা মাত্র। এই মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হতে মুক্ত হন।

গীতায় বলা হয়েছে—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভী জয়াজয়ৌ

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাস্যমি।

সরলার্থ— সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয় তুল্য চিন্তা করিয়া যুদ্ধ কর। ইহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—নবযুগ পাবলিকেসঙ্গ পৃঃ ৩৯।

এর মূল কথা হল—

শঠে শাঠ্যং সমাচরেথ [শঠের সাথে শঠতাপূর্ণ আচরণ করবে]

বুদ্ধ বললেন—

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং।

অবেরেন চ সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো।

ধম্মপদ-ধর্মধার মহাস্থবির—পৃঃ ২।

বঙ্গানুবাদ— শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা কখনোই উপশম হয় না। মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম। এজন্যেই বুদ্ধ বললেন—

অক্কাধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে,

জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলীকবাদিনং।

—ধর্মপদ।

বঙ্গানুবাদ— ক্রোধীকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় করবে।

অতএব, যা সদ্ধর্ম, তাই সনাতন বা চিরন্তন ধর্ম।

২.

মহাসতিপট্ঠান বা চার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা হল—কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। এই ভাবনার আলম্বন বা অবলম্বন হল নাম-রূপ। সুতরাং দেহ ও মনের সকল ক্রিয়ায় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার সাধনাই হল বিদর্শন ভাবনা।

আমাদের দেহে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম চলছে এরূপ কয়েকটি ক্রিয়া আছে। যেমন, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এবং তৎফলে পেটের ফোলা-কমা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির বিট ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে পেটের ফোলা-কমা ও শ্বাস-ক্রিয়া আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। নাম-রূপের আরো বহু প্রকারের ক্রিয়া বা উপসর্গ আছে যেগুলো অস্থায়ী। কোনটা অতি দ্রুত বিলীন হয়, আর কোনটা দীর্ঘস্থায়ী। যেমন, ব্যথা, চুলকানি, রাগ, লোভ, মোহ, সর্দি-কাশী, জ্বর ইত্যাদি। উপবেশন পদ্ধতি ও শয়ন

পদ্ধতি বিদর্শন ভাবনায় শ্বাস-ক্রিয়া ও পেটের ফোলা-কমা এ দুটোর একটাকে আলম্বন ধরে মনকে একাগ্র করার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। মন একাগ্র হলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয়ের সম্যক ধর্মকে উপলব্ধি করা সহজ হয় এবং অকুশল কর্ম সম্পাদন হতে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন গঠন করা সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে, ভাবনা হল মনের প্রশিক্ষণ, মনকে একাগ্র করার প্রশিক্ষণ অর্থাৎ মনকে বশে রাখার প্রশিক্ষণ। ভাবনার সময় দেহ ও মনে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন, দেহে চুলকানি, ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে। তখন মন শ্বাস-ক্রিয়া ও পেটের ফোলা-কমা এ দুটোর যেটাকে মূল বিষয় ধরে ধ্যান আরম্ভ করা হয়, সেটা ছেড়ে নতুন উদয়-হওয়া আলম্বনে চলে যেতে পারে। তখন সাধকের উচিত স্মৃতিকে সজাগ রেখে ঐ নতুন উদয়-হওয়া আলম্বনে গেছে বলে জানা এবং নতুন আলম্বনকেও জানা। তারপর ঐ আলম্বন বিলীন হয়ে গেলে অর্থাৎ ব্যথা, চুলকানি, মনের ক্রোধ, ক্লেভ ইত্যাদি প্রশমিত হয়ে গেলে মনকে আবার মূল আলম্বনে ফিরিয়ে নেয়া। মন এক সাথে দুটো আলম্বন গ্রহণ করতে পারে না। স্মৃতি সজাগ থাকলে অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে স্মৃতি প্রবল হলে মন ধ্যেয় আলম্বন ছেড়ে অন্য আলম্বন গ্রহণ করতে পারে না। অসতর্ক মুহূর্তে অন্য আলম্বনে গেলেও স্মৃতি বা সচেতনতা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই মূল আলম্বনে ফিরে আসে। সাধক নিজেই নিজের ধ্যানের সফলতা বুঝতে পারবেন অর্থাৎ নিজের মনকে কতটুকু একাগ্র করা সম্ভব হয়েছে তা বুঝতে পারবেন। যদি বেশি সময় মনকে ধ্যেয় আলম্বনে (বসা ধ্যানে পেটের ফোলা-কমা বা শ্বাস-ক্রিয়ায় আর চংক্রমণ ধ্যানে পায়ের তোলা-ফেলায়) ধরে রাখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, মন অনেকটা একাগ্র হয়েছে, অর্থাৎ নিজের বশে এসেছে। ধৈর্য সহকারে ধ্যান চালিয়ে গেলে মন একাগ্র হবেই।

স্মৃতি বা সচেতনতাকে শুধু দৈনিক এক ঘণ্টা (খণ্ড ধ্যানে) বা ধ্যান শিবিরে দশ বারো দিন ধরে রাখাই যথেষ্ট নহে। প্রাত্যহিক জীবনের সব কাজে ও চিন্তায় জাগিয়ে রাখতে পারলেই মানুষ অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে এবং নানা দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এ জন্য বসা ধ্যান ও চংক্রমণ ধ্যান একটার পর অন্যটা প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য হলেও চালিয়ে যেতে হয়। তবেই স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা সহজ হয়।

মঙ্গল সূত্রে বলা হয়েছে—

ফুট্ঠস্ স লোকধম্মেহি চিস্তং যস্ স ন কম্পতি,

অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

—অষ্ট লোক ধর্মে (লাভ, ক্ষতি, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদিতে) অবিচল থাকা, শোকহীনতা, লোভ-দ্বेष-মোহরূপ কলুষহীনতা ও ভয়হীন থাকা—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

সাধারণ মানুষ এই অষ্ট লোকধর্মে অবিচল থাকতে পারে না। তারা বিচলিত হয় এবং তৎফলে নানা প্রকার মানসিক রোগ ও মানসিক হতে উদ্ভূত শারীরিক রোগ এবং দুর্ঘটনার শিকার হয়। কিন্তু যারা ভাবনার মাধ্যমে মনকে একাগ্র করতে সমর্থ হয় তারা এ রকম রোগ ও দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যাদের মন একাত্ম নহে অর্থাৎ যাদের মন বিক্ষিপ্ত তারা হাঁটবার সময় নানা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আহত হয়, এমন কি এর ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ জন্যই বৌদ্ধ ধর্মে স্মৃতিসহকারে পদক্ষেপ দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

সতং হৃদি সহস্সানি, সতং অস্সা সতং অস্সতরী রথা,  
সতং কঞঞা সহস্সানি, আমুত্ত মণিকুণ্ডলা,  
একস্স পদবীতিহারস্স কলং নগ্ঘতি সোলসিং।

—বিদর্শন ভাবনা—শ্রী প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া (ধর্ম বিহারী খের) পৃঃ অবতরণিকা (।।)  
এর মর্মার্থ হলো— এক লক্ষ হাতি, এক লক্ষ অশ্ব, এক লক্ষ অশ্বরথ, এক লক্ষ কন্যা মণিমুক্তার দ্বারা সজ্জিত করে দান করলে যে পরিমাণ পুণ্য, তা (সাধকের) স্মৃতিসহকারে একটি পদক্ষেপের (১৬x১৬) বা ২৫৬ ভাগের ১ ভাগ সমান হবে না।

অতএব সচেতনতার উপরই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। তাই স্মৃতি সাধনার মাধ্যমে মনকে একাত্ম করে অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে এবং দুর্ঘটনা ও নানা মানসিক ও শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদনের দ্বারা সুখী-সুন্দর-সুশৃংখল জীবন গঠন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হউন। শিশু ও যুবক বয়সে যারা মনকে একাত্ম করতে পারে তারা সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে এবং আর্থ-অষ্টাগ্নিক মার্গের অনুশীলন করে নির্বাণগামী হয়। তাই তাদেরও কিছুদিন ধ্যান অভ্যাস করা উচিত। যারা বয়স্ক তারাও সময়ক্ষেপ না করে নিষ্ঠার সাথে অধ্যবসায় সহকারে বিদর্শন ভাবনা চালিয়ে গেলে সাফল্যমণ্ডিত হবেন বৈকি।

অনেকে কুশল কর্ম বলতে শুধু দান করা, ভাবনা করা, গৌসাইর সামনে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি মনে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে কোন সৎ কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। যেমন, সৎভাবে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা, কৃষিকাজ ইত্যাদি সব কাজই সৎ কর্ম। যদি সৎ পেশা দ্বারা টাকা উপার্জন করা না হয়, তাহলে দানের ফল আশানুরূপ হয় না। জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। ইচ্ছা করলেই তো বয়স বাড়ানো যায় না। তাই অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা যত শীঘ্র মনকে একাত্ম করা যায়, ততই মঙ্গল। মনকে একাত্ম করে অন্যান্য সৎ কর্ম সম্পাদন করাও কুশল কর্ম। মনকে একাত্ম করলাম, আর কোন সৎ কর্ম করলাম না, এর মানে এই নয় কি, কষ্ট করে ভাত পাক করলাম কিন্তু খেললাম না। অতএব বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে মনকে একাত্ম করে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক সব কাজ স্মৃতি সহকারে সম্পাদন করুন।

সাধারণ মানুষ মনে করে যে, তারা সব কাজ স্মৃতি সহকারে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। অভিজ্ঞ গুরুর অধীনে কয়েকদিন ধ্যান অভ্যাস করলেই তাদের ভুল ধারণা চলে যাবে। তখন মৌলিক সত্য উদ্ভাসিত হবে। সত্য জ্ঞান লাভ তথা প্রজ্ঞা লাভই সম্যক সাধনার প্রত্যক্ষ ফল।

[বিস্তারিত জানার জন্য আমার বন্দনা-প্রার্থনা-ভাবনা বই পড়ুন।]

পরিশিষ্ট-৩  
বিবাহ বিধি

১। সূত্রদাতার উপদ্রব বন্ধ করা

অম্বাহকং খো পন ভগবা দীপঙ্করপাদমূলতো পট্টায় পঠমং দানপারমী, দুতিয়ং সীলপারমী, ততিয়ং নেক্খম্মপারমী, চতুথং পঞ্ণা পারমী, পঞ্চমং বিরিয়পারমী, ছট্ঠং খন্তিপারমী, সত্তমং সচ্চপারমী, অট্টমং অধিট্ঠানপারমী, নবমং মেত্তাপারমী, দসমং উপেক্খাপারমী'তি দসপারমিয়ো, দস উপপারমিয়ো, দস পরমথপারমিয়ো'তি সমতিংসপারমিয়ো পুরেসি, তাসং পারমীনং আনুভাবেন ময়্হং সকে উপদ্রবা বিনাসমেত্ত্ব।

২। বর-কন্যার উপদ্রব বন্ধ করা

পুরথিমায় দিসায়, দক্খিনায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরথিমায় অনুদিসায়, দক্খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায়, সকে সত্তা, সকে পাণা, সকে ভূতা, সকে পুগ্গলা, সকে অন্তভাবপরিয়াপন্থা, সকা ইথিয়ো, সকে পুরিসা, সকে অরিয়া, সকে অনরিয়া, সকে দেবা, সকে মনুস্সা, সকে অমনুস্সা, সকে বিনিপাতিকা অবেরা হোত্ত্ব, অব্যাপজ্জা হোত্ত্ব, অনীঘা হোত্ত্ব, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত্ব, দুক্খা মুঞ্চন্ত্ব; যথালঙ্ক-সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত্ব কম্মস্সকা। ইমিনা মেত্তানুভাবেন জয়স্পতিনো সকে উপদ্রবা বিনাসমেত্ত্ব।

৩। সূত্রদাতার গুরু প্রণাম ও শরণ গমন

পঠমং ছত্তিংস মহাপুরিসলক্খণ-সম্পন্নং অসীতি অনুব্যঞ্জনপতিমণ্ডিতং, নিরোধসমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্ণং বিয় ভগবত্তং অরহত্তং সম্মাসমুদ্বং নমামি, দুতিয়ং আচরিয়ং নমামি, ততিয়ং তিরতনং সরণং গচ্ছামি।

৪। বর-কন্যার আসন বন্ধ করা

যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাগো স্কুণস্স সন্দো, পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকত্তং, বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেত্ত্ব, ধম্মানুভাবেন বিনাসমেত্ত্ব, সজ্জানুভাবেন বিনাসমেত্ত্ব।

৫। বরকে কন্যা সম্প্রদান

(কন্যার অভিভাবক কর্তৃক)

তুয়্হং দীঘরত্তং হিতায় সুখায় ইমং কঞ্ণেং গণ্হাহি। (৩ বার)

৬। বরের হস্তে কন্যার হস্ত অর্পণ করা

(কন্যার অভিভাবক কর্তৃক)

দ্বিহথং সম্বন্ধং বিয় তুম্হেপি সক্ককালং সমগ্গভাবেন বসথ, অঞ্ণেংমঞ্ণেং দেব-দেবীনং বিয় সংবাসো চ হোতু।



### ৭। বর ও কন্যার পদ সংযুক্ত করা

ইদং পাদদ্বয়ং সম্বন্ধকরণং, তুম্হাকং যাবজীবং অঞ্ঞমঞ্ঞগিহীধম্মং  
সমাদানায় চেব কুসল কম্মং করণথায় চ অবিসংযোগস্ পচ্চয়ো হোতু ।

### ৮। সূত্রদাতা কর্তৃক বর-কন্যার মঙ্গল কামনা

নথি তে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো তে সরণং বরং,

বুদ্ধতেজেন লোকস্ তাণা লেণা পরায়ণা;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

নথি তে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো তে সরণং বরং,

ধম্মতেজেন লোকস্ তাণা লেণা পরায়ণা;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

নথি তে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘো তে সরং বরং,

সংঘতেজেন লোকস্ তাণা লেণা পরায়ণা;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

[তৎপর সূত্রদাতা ও বর-কন্যার সম্মুখে বেদীর উপর স্থিত সপল্লব জলপূর্ণ  
কলসী হতে দুই হাতে দুই পল্লব নিয়ে নিম্নোক্ত সূত্রটি পাঠ করবেন এবং  
সাতবার সূত্র বলে সাতবার পল্লবস্থিত জল বর-কন্যার শিরোপরি ছিটিয়ে  
দেবেন ।]

### ৯। আবাহ-বিবাহ মঙ্গল কামনা

সিদ্ধিরাজস্ সাসনে সিদ্ধিকিচ্ছং কারতো,

সিদ্ধিভাবা সমিদ্ধস্ত সিদ্ধিলাভা ভবন্ত তে ।

জয়ন্তো বোধিয়ামূলে সাক্যানং নন্দিবড়নো,

এবমেব জয়ো হোতু জয়স্ সু জয়মঙ্গলে,

অপরাজিত পল্লব্বে সীসে পুথু বিমুক্খলে,

অভিসেকে সম্মুদানং অগ্নপ্পত্তো পমোদতি;

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং ।

জয় জয় মঙ্গলং বোধিপল্লব্বং'ব

জয় জয় মঙ্গলং ধম্মচক্কং'ব

জয় জয় মঙ্গলং সৰ্ব্বগুণ-পাণিনং'ব

জয় জয় মঙ্গলং ঐরাণাদিস্তিং'ব

জয় জয় মঙ্গলং সাধু সুপ্পতিট্ঠিতানং'ব ।

## ১০। বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করা

সমসীলা সমসদ্ধা ভবন্ত উভয়ো সদা  
 আয়ু-বল্লং-সুখং-বলং পটিভাগং ভবন্ত তে ।  
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্বদেবতা,  
 সৰ্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে,  
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্বদেবতা,  
 সৰ্বধম্মানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে,  
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্খন্ত সৰ্বদেবতা,  
 সৰ্বসজ্জানুভাবেন সদা সোথি ভবন্ত তে ।  
 সৰ্বে সন্তা সুখীতা ভবন্ত ।

বিঃ দ্রঃ বাংলা ভাষায় পূর্বে ২টি ‘ব’ ছিল। একটি বর্গীয় ‘ব’ ও অপরটি অন্তঃস্থ ‘ব’। বর্তমানে অন্তঃস্থ ‘ব’ বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা দিয়ে লিখিত পালি ভাষায় ‘ব’ এর দু’রকম উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। একটি ‘ব’ এর উচ্চারণ ‘ব’। যেমন বুদ্ধ, বোধিসত্ত, সম্মুদ, সৰ্ব, অনুব্যঞ্জন ইত্যাদি।

অপর ‘ব’টির উচ্চারণ ‘ওয়া’। যেমন, ‘বন্দামি’ এর উচ্চারণ ‘ওয়ান্দামি’। সচ্চবজ্জেন এর উচ্চারণ ‘সচ্চওয়াজ্জেন’। বিপত্তি-ওয়িপত্তি, এবমেব-এওয়ামেওয়া, দেবা-দেওয়া, ভগবা-ভগওয়া, অবেরা-অওয়েরা, ভবতু-ভওয়াতু, অবমঙ্গলঞ্চ-অওয়ামঙ্গলঞ্চ, বিয়-ওহিয়। বিনাসমেত্ত-ওয়িনাসমেত্ত, বসথ-ওয়াসথ, বিগচ্ছন্ত-ওয়িগচ্ছন্ত, উপদ্দবা-উপদ্দওয়া, অন্তভাব-অন্তভাওয়া, অনুভাবেন-অনুভাওয়েন, যাবজীবং-যাওয়াজীবং, সংবাসো-সংওয়াসো, বিনিপাতিকা-ওয়িনিপাতিকা বরং-ওয়ারং, অব্যাপজ্জা-অওয়্যাপজ্জা, বিরিয়-ওয়িরিয়, সিদ্ধিভাবা-সিদ্ধিভাওয়া, চেব-চেওয়া, নন্দিবড়টনো-নন্দিওয়াডটনো, বিমুক্খলে-ওয়িমুক্খলে, অবিসংযোগস্-অওয়িসংযোগস্।

## আমার গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো :

- ১। মহাকাব্যিক বুদ্ধ।
- ২। আধুনিক যুগশ্রেষ্ঠিতে বুদ্ধবাণী।
- ৩। বন্দনা-প্রার্থনা-ভাবনা।
- ৪। প্রার্থনা পদ্ধতি, বন্দনা ও প্রতিপাল্য নীতি।
- ৫। যে আমি ওই ভেসে চলে (আত্মজীবনী)।
- ৬। করুণাময়ী বিশাখা।